আলোর স্বাক্ষর

আশাপূর্ণা দেবী

পরিবেশক :

মিত্র ও ঘোষ

১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

৫·৫০

আষাঢ় ১৩৬৭ সাল

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন—শ্রীকানাই পাল

মুদ্রণ—রিপ্রোডাকৃশন সিণ্ডিকেট

গুপ্ত প্রকাশিকা, ১২১-এ বালিগঞ্জ টেরেস, কলিকাতা ১৯ হইতে বাসন্তী দাশগুপ্ত কর্তৃক
প্রকাশিত ও শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৩৭-বি বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৯
হইতে শ্রীপ্রদোষ কুমার পাল কর্তৃক মুদ্রিত

কমলা চুপ করে জানলায় বসেছিল।

এই মাত্র কেষ্টমোহিনী যাচ্ছেতাই করে গেছে। স্পষ্ট বলে গেছে কমলার এই সৌখিন পেশার উপর ভরসা রেখে আর চলতে রাজী নয় সে।

সোজা পথের মানুষ কেষ্টমোহিনী, সহজ সোজা পথটাই বোঝে। ঘুরপথের ঘূর্ণিকে বিশ্বাস কি? মানুষ ঠকিয়ে বেড়িয়ে যে উপার্জন, তার ওপর আবার নির্ভর! গতর খাটাও, ঘরে টাকা তোল। আর কমলা যদি একবার সে পথে নামে তা'হলে তো বাঁকের ওজনে টাকা তুলবে ঘরে। শুধুই যে বয়েস আছে তা তো নয়, ভগবানের দেওয়া মস্ত একটা ঐশ্বয্যি রয়েছে কমলার। পরীর মতন রূপ! সে রূপ কি ওই হতভাগা ননীর কুঁড়েঘর আলো করে বসে থাকবার জন্যে?

আর যে আশায় বুক বেঁধে কমলাকে খাইয়ে পরিয়ে এত বড়টি করে তুললো কেষ্টমোহিনী, সে আশায় ছাই ঢেলে দিয়ে, গেরস্থর বৌটি হয়ে নিজের সংসারটি পাততে সরে পড়াই কি ধর্ম হবে কমলার?

কমলা অবশ্য কেঁদে ফেলে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল,—কমলার যদি সংসার হয়, সে সংসারে কি কেষ্টমোহিনীর ঠাঁই হবে না? কেষ্টমোহিনী সে কথা ব্যঙ্গহাসি হেসে তুড়ি দিয়ে উড়িয়েছে।

'হুঁঃ বলে অমন সবাই। এ যুগে বলে পেটের ছেলেমেয়ের সংসারেই বুড়িদের ঠাঁই হয় না, তার আবার পাতানো বোনঝির সংসারে! কেষ্টমোহিনী কমলাকে খাইয়ে পরিয়ে বড়টি করেছে, এ মান্য দেবে ননী?...মানবে সে কথা? বলে জন্মদাতা পিতার ঋণই

মানতে চায় না এখনকার ছেলেরা! ও সব ছেঁদো কথায় ভোলবার পাত্রী কেষ্টমোহিনী নয়। তা'ছাড়া—ননী যে তাকে কী দু'চক্ষের বিষ দেখে সে কথা কি জানতে বাকী আছে কেষ্টমোহিনীর ?'

না—কমলার কাতরতায় আর কান দেবে না কেষ্টমোহিনা, লক্ষ্মীছাড়া ননীকেও আর এ বাড়িতে ঢুকতে দেবে না।

ঘণ্টাখানেক ধরে বুঝিয়ে জপিয়ে, খিঁচিয়ে শাসিয়ে, ভয়ংকর একটা দিব্যি গেলে, ঘটি-গামছা নিয়ে এই খানিক আগে গঙ্গায় গেল কেষ্টমোহিনী। কিছুদিন থেকে এই এক বাতিক হয়েছে তার, নিত্য গঙ্গাস্নান। তা' বাতিকটা হয়ে ভালই হয়েছে, ঘণ্টা তিনেকের মত নিশ্চিন্দি। গঙ্গাস্নানে গিয়ে ফোঁটা-তেলক কাটবে কেষ্টমোহিনী, পাঁচটা সখী-সঙ্গিনীর সঙ্গে আলাপ-সালাপ করবে, যত দেব-দেবী, শিবশিলা আছেন আশেপাশে, তাঁদের মাথায় জল ঢালবে, গঙ্গার ঘাটে যে বাজার বসে, সেখান থেকে দেখে শুনে দরাদরি করে রোজের বাজারটা সারবে, তারপর এক হাতে মাছ তরকারি, আর আর-এক হাতে ঘটি-গামছা নিয়ে রৈ রৈ করতে করতে বাড়ি ঢুকবে। ইত্যবসরে যদি কমলা সময়ের তাক্ বুঝে উনুনের আঁচটা না ধরিয়ে রাখলো, তাহলে অবশ্য রক্ষে নেই। রৈ রৈ কাণ্ডর মাত্রা তা'হলে চরমে উঠবে।

সময়ের তাক্ বুঝতে দশমিনিট অন্তর ঘড়ি দেখতে হয় কমলাকে। তবু যেইমাত্র বেরিয়ে যায় কেষ্টমোহিনী, কমলা যেন হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচে। খানিকক্ষণের জন্যে যেন বুকের পাষাণ ভার নামে। একটুক্ষণ আপনার মন নিয়ে বসে থাকতে পায়।

আর এইটুকুই তো ননীর সময়।

কেষ্টমোহিনী যতই গালমন্দ করুক, আজও ননী এল।

ঘরে ঢুকে বলে উঠল 'বিরহিণী রাইয়ের মতন বসে আছিস যে?

মাসির রান্নার জোগাড় করছিস না ?'

কমলা জানলা থেকে নেমে এসে চৌকির ওপর বসে বলে, 'এই মাত্তর গেল।'

'এই মাত্তর ? কেন বেলা তো অনেক হয়েছে।'

'এতক্ষণ আমার মুণ্ডুপাত করছিল।'

'উঃ কবে যে বুড়িটার হাত থেকে রেহাই পাবি !'

'রেহাই আর পেয়েছি !' কমলা নিশ্বাস ফেলে বলে, 'এ জীবন থাকতে নয়। একদিন এসে দেখবে কমলি ওই কড়িকাঠে ঝুলছে।'

'মেজাজ খারাপ করে দিসনি কমলি,' ননীও চৌকিটায় কমলার গা ঘেঁসে বসে পড়ে বলে, 'কড়িকাঠ আমারও আছে, আছে রেললাইন, দোতলা বাস, মালের লরী…বুঝলি ?'

'ওঃ ভারী মহিমা দেখানো হচ্ছে। বেটাছেলে, উনি এসেছেন আত্মহত্যের ভয় দেখাতে ! লজ্জা করে না ?'

'লজ্জা !' ননী ম্লান হেসে একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, 'সে কথা আর বলে লাভ কি বল ? তার যখন কোনও প্রমাণ দিতে পারছি না। সেই দুঃখেই তো মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় বিষ খাই কি রেললাইনে কাটা পড়ি। পারি না শুধু—'

'পারো না শুধু আমার জন্যে, কেমন ?' কমলা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'আমাকে আর তুমি কাব্যিকথা শোনাতে এসো না ননীদা, ঢের হয়েছে। কেন, পৃথিবীতে আর কোথাও একটা চাকরি জোটাতে পারো না ? পালাতে পারো না আমাকে নিয়ে ?"

'চাকরি জোটানো যে কী বস্তু তা যদি জানতিস, তা'হলে এমন কথা বলতিস না।'

'জানবো না আর কেন, হাড়ে হাড়েই জানছি ! দেখছি তো প্রত্যক্ষ, যেমন পদের চাকরিতে বিয়ে করবার সাহস হয় না, বৌকে দুটো ভাত দেবার ভয়ে তেমন চাকরি ছাড়তেও যখন এত আতঙ্ক, তখন

আবার বুঝতে বাধা কি যে, চাকরি হচ্ছে আকাশের চাঁদ! তাই তো বলছি ননীদা—ধরে নাও কমলি মরেছে।'

হঠাৎ একঝলক জল উপছে ওঠে কমলার ভাসাভাসা চোখদুটোয়। বোধকরি এ জল নিজেরই মৃত্যুশোকে।

ননী কিছুক্ষণ মাটির দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, 'আর একটা চান্স নে কমলি, তারপর দেখিস যে করে পারি তোকে এই নরকপুরী থেকে উদ্ধার করবো।'

'ও রকম প্রতিজ্ঞা তো অনেকবার করলে।'

'তা বটে!' ননী একটু চুপ করে থেকে ফের একটা নিশ্বাষ ফেলে বলে 'ছবিটা এনেছিলাম রেখে যাই। সত্যিই বলেছিস, হতভাগা লক্ষীছাড়া গরিবের আবার প্রতিজ্ঞে।'

'ওঃ বাবুর অমনি রাগ হয়ে গেল!'

'রাগ নয়রে কমলি, ধিক্কার! মাসি তো আজ আমাকে জুতো-মারতেই বাকী রেখেছে শুধু। বলেছে, ফের এ বাড়িতে এলে সত্যি জুতো মারবে।'

'বলেছে এই কথা?'

ঠিকরে দাঁড়িয়ে ওঠে কমলা।

'প্রায় ওই কথাই।'

'তবু তুমি এলে?'

'এলাম তো।'

'সত্যিই গলায় দড়ি দেওয়া উচিত তোমার ননীদা। যাও বলছি এক্‌খুনি।'

'তুইও তাড়াচ্ছিস্।'

'নয় তো কি, মাসি এলে আর একপালা রামায়ণ গান শুনবো বসে বসে? আমি তো বলেছি ননীদা, তোমার যখন মুরোদ নেই তখন

আর আমার চিন্তা করে করবে কি? আমার আত্মহত্যে ছাড়া গতি নেই। আর যদি তুমি হুকুম করো মাসির হুকুমই মানি তা'হলে—'

'কমলি!'

আচমকা একটা ধমক দিয়ে ওঠে ননী।

'আর কমলি!'

কমলাও নিশ্বাস ফেলে।

'মাইরি বলছি কমলি, এই শেষ চান্সটা নে। এরা খুব বড়লোক, তা ছাড়া বাবু হচ্ছেন দেশোদ্ধারী নেতা, একটা অপবাদ অপকলঙ্ক হলে আর মুখ দেখাতে পারবে না, দেশোদ্ধারের গয়াপ্রাপ্তি ঘটবে। সেই ভয়ে মুখবন্ধ করতে মোটা ঘুস-ই দেবে মনে হচ্ছে।'

'আর যদি সেই মল্লিকবাবুদের মতন থানা-পুলিস করে?'

'আহা-হা, সে হলগে একটা দৈবের ঘটনা। সেদিন পড়েছিলি একেবারে বাঘা কর্তার মুখে। একটু বুঝে সমঝে যেতে হবে।'

'মাসি আর রাজী হবে না।'

'সে ভয়ও আছে। এবারটার মতন বলেকয়ে রাজী করা। কিন্তু মাইরি বলছি তোকে কমলি—কেন কে জানে এবারের ছবিটা তুলে অবধি প্রাণের মধ্যে যেন কুলকাঠের আগুন জ্বলছে।'

'কেন বলতো?'

কৌতুক কৌতূহলে প্রশ্ন করে কমলা।

'ওই তো বললাম কেন কে জানে। বাবুটার সঙ্গে তোকে বড্ড বেশী ম্যাচ্ করেছে বলেই বোধ হয়।'

'বাবুটার সঙ্গে আমার, না ছবিটার সঙ্গে ছবির?' বলেই সমস্ত দুঃখ ভুলে হঠাৎ খিলখিল করে হেসে ওঠে কমলা।'

বয়সের ধর্মই এই, সহসা কোনও কৌতুকে সব দুঃখ ভুলে হাসতে পারা।

'তা' বললে কি হয়, দেখে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।'

কমলা তেমনি হাসিহাসি মুখে বলে, 'নিজেই তো বার করেছ বুদ্ধি, নিজেই তো করছো সব কৌশল।'

'করেছি কি আর সাধে।' ননী উঠে দাঁড়ায়, দাঁড়িয়ে কমলার একগোছা চুলে টান মেরে বলে, 'যা এখন চুলোয় আগুন ধরাগে যা, নইলে তো আবার মাসি এসে এখন তোর মুখে আগুন ধরাবে !'

চলে যাচ্ছিল ননী।

হয়তো বা ভুলে, হয়তো বা ইচ্ছে করে কমলা বলে ওঠে, 'তা' কই, সে ছবি কই ? যা নিয়ে তোমার এত হিংসে !'

'ও ভুলেই যাচ্ছি।'

পকেট থেকে একটা খাম বার করে ননী। সন্তর্পণে তার থেকে একখানা বড়ো সাইজের ফটো বার করে। আর করবার সঙ্গে সঙ্গেই চোখটা যেন দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে তার।

মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বলে, 'নে দেখ, দেখে চক্ষু সার্থক কর।'

'চক্ষু সার্থক মানে ?'

'মানে আর কি, যুবরাজের পাশে যুবরানীর মতন দেখাচ্ছে তাই বলছি।'

'ধন্যি হিংসে বটে ! তবু যদি সত্যি হতো।···আচ্ছা ননীদা, এত বেমালুম মেলাও কি করে বলতো ?' বলে কমলা ছবিখানা চোখের সামনে তুলে ধরে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

একটি উজ্জ্বল দৃষ্টি সুকান্তি যুবকের মুখের পাশাপাশি একখানি ওড়নাঢাকা নববধূর মুখ। সে মুখ কমলার নিজের। গলায় ফুলের মালা, কপালে টিক্‌লি, মুখে চন্দনরেখা।

কনে সাজলে এত সুন্দর দেখায় কমলাকে ! আর পাশের মুখখানা বর না সেজেও কী সুন্দর। এযাবৎ এত লোককে ঠকিয়েছে কমলা, কিন্তু এত সুন্দর কাউকে নয়। মনটা মায়ায় ভরে ওঠে, ভারাক্রান্ত হয়ে আসে অপরাধ-বোধের ভারে।

'সত্যি বলনা ননীদা, এত পরিষ্কার মেলাও কি করে ?'

'ওইটুকুই কৌশল ! এত দিন যাবৎ ফটোগ্রাফের দোকানে কাজ করে আর ফটোগ্রাফি শিখে ওইটুকুই বিদ্যে হয়েছে।"

কমলা আবারও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকে ছবিটা।

ননী ভুরু কুঁচকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে ওঠে, 'দেখে দেখে যে আর আশ মিটছে না রে কমলি ?'

'ধেৎ !' কমলা ফটোখানা চৌকিতে ফেলে রেখে বলে, 'তোমার দেখছি আজ মেজাজ বড় খারাপ।'

'তা' হবে। যাক চলি। ভাল কথা। বাবুর ঠিকানাটা রাখ।'

বলে ছেঁড়া-চটিটা ফটফট করতে করতে চলে যায় ননী। জামার পিঠের সেলাইটা যেন নির্লজ্জভাবে দাঁত খিঁচিয়ে থাকে কমলার দিকে, যতক্ষণ দেখা যায়।

খানিকক্ষণ গুম্ হয়ে বসে থাকে কমলা, তারপর হঠাৎ একসময় চট্‌কা ভেঙে উঠে পড়ে উনুনে আঁচ দিয়ে আসে। আর এসে ফের সেই ছবিখানাই তুলে নেয় হাতে।

সত্যি কমলা কি অভাগিনী।

এমন দেবতার মত মুখওলা মানুষটার নামে মিথ্যে কলঙ্ক দিতে হবে তাকে !

ভারী রাগ আসে ননীর ওপর।

কিছুতেই কেন কোন উপায় করতে পারছে না ননী। কমলার কেবলই মনে হয় ননী যদি তেমন চেষ্টা করতো তা হলে বুঝি একটা উপায় হতো। বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ছবিটাই দেখতে থাকে কমলা।

যথারীতি রৈ রৈ করতে করতে এল কেষ্টমোহিনী।

'হ্যাঁলা কমলি, উনুনটা যে জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে, ডালটা

বসিয়ে দিতে পারিসনি ?'

কমলা অপ্রতিভ ভাবে বলে, 'আগুন ধরে গেছে ?'

'গেছে না তো কি মিছে বলছি ? বলি করছিলি কী এতক্ষণ ?'

'করবো আবার কী।'

কেষ্টমোহিনী ঘরে-ঢুকে পড়ে সন্দিগ্ধভাবে এদিক ওদিক তাকিয়েই চৌকির ওপর পড়ে-থাকা বড় খামটাকে দেখতে পায়। সেই ফটোর খাম। এ জিনিস তার পরিচিত। দেখেই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে কেষ্টমোহিনী—'ছোঁড়াটা আবার এসেছিল বুঝি ? ধন্যি বলি বেহায়া, এত গালমন্দ দিলাম, তবু লজ্জা নেই গো !'

কমলা ম্লানভাবে বলে, 'বলে গেল, এই ফটো, এই ঠিকানা।'

'বলে গেল তো কেতাথ করলো। আমি তো তোকে ঝাড়া জবাব দিয়েছি কমলি, ও সবের মধ্যে আর নেই আমি। এ ঝুঁকি নিতেই বা যাব কেন ?'

'আমার মুখ চেয়ে, আর কেন ?'

'তোর মুখ চেয়ে চেয়ে এতদিন গেল। বাসার সবাই আমার গালে মুখে চুন দিচ্ছে। বলে কুড়ি বছরের ধাড়ীকে তুই এখনো ভাতকাপড় দে পুসছিস কেষ্ট ? বলি ওর একটা কর্তব্য নেই তোর প্রিতি ?...বলবে নাই বা কেন ? ক্ষীরির মেয়েটা তোর চাইতে কোন্ না পাঁচ বছরের ছোট, সে-ও তো কবে থেকে মায়ের হাতে ট্যাকা তুলে দিচ্ছে।'

'মাসি !' কমলা ছলছল চোখে বলে, 'আমাকে দিয়েও তো টাকা হচ্ছে তোমার।'

'আরে বাবা সে হলগে ঝুঁকির ট্যাকা ! সকল দায় আমি মাথায় করে, হাজার মিথ্যে কথা কয়ে...তবে না ? বলতে গেলে ও ট্যাকা তো আমার 'উপার্জন।...ও আর আমার ভাল লাগে না—বড়লোকের দেউড়ি ডিঙোতে বুক কাঁপে। ছিঁড়ে ফেলে দিগে যা ফটো। আমি আজই সেই মেড়ো ছোঁড়ার সঙ্গে কথা কয়ে আসব। সে বলেছে

বিয়ে করবে।'

কমলার বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করে ওঠে ভয়ংকর একটা ভয়ে।'

এ পল্লীতে বিয়ে বস্তুটা যে কী, তা আর তার জানতে বাকী নেই। তাই কাতরকণ্ঠে বলে, 'আর একবারের মতন দেখ মাসি।'

'না না। বলি আর একবারের মতন দেখলেই বা আমার কি ক্ষতি লাভ হবে? ওই ননে হারামজাদার সঙ্গে তোর বে' দেব ভেবেছিস

'বেশ বাপু দিও না।'

'তা'হলে? তা'হলে কি ধর্মের ষাঁড় হয়ে থাকবি? তোর ওজর-আপত্তি আর শুনছিনে আমি।'

হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে ওঠে কমলা। বলে, 'আমার অনিচ্ছেয় তুই আমায় দিয়ে যা খুশি করাতে পারিস ভেবেছিস?···পুলিসে গিয়ে যদি শরণ নিই, তোর কী দশা হবে জানিস?'

কমলার দপ্ করে জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দপ্ করে নিভে যায় তার মাসি। আমতা আমতা করে বলে, 'তা বলবি বৈকি, এই তো কলির ধর্ম! বুড়ি মাসিকে পুলিসে ধরিয়ে দিয়ে ভাল প্রিতিদানই দিবি। হবে না কেন! কুবুদ্ধি তো হবেই, বুদ্ধিদাতা শনি যে জুটে বসে আছেন! সাধে কি আর ননেকে ঢুকতে দিতে চাইনে। বংশের ছেলে, এল গেল কি দুটো হাসি মস্করা করলো, তাতে কিছু বলতাম না। এ যে ক্রমশ আমার মটকায় আগুন লাগাচ্ছে। বলে কি না পুলিসে খবর দেবো!···দে দে, তাই যদি তোর ধর্মে হয় তো দে। যা এখুনি যা, ডেকে আন পুলিস, হাতে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাক পাড়ার বুকের ওপর দিয়ে।'

কমলা হেসে ফেলে।

দুঃখের মধ্যেও হেসে ফেলতে পারে সে, এই তার স্বভাব। হেসে বলে, 'এখুনি যাবো তা' তো বলিনি। বেশি যদি জ্বালাতন করো

তবেই।…কী দরকার আমাদের বেশি টাকায় মাসি?’

“আহা লো! ন্যাকা এলেন আমার।’ বলে ঝটকান মেরে চলে যায় কেষ্টমোহিনী। আর আশ্চর্যের বিষয়, কমলা সেই ছবিখানাই দেখতে থাকে আবার।

নিজেকে দেখতে এত ভাল লাগে কেন, কেন এমন নেশা লাগে? কেন দেখে দেখেও আশ মিটতে চায় না!

কিন্তু শুধুই কি নিজেকে?

আচ্ছা—এই ছবিটা মুছে ফেলে এখানে ননীর মুখটা সেঁটে দিলে কেমন হয়?…অনেকবার ভাবতে চেষ্টা করলো কমলা নিজের সেই হাসি ঢলঢল কনে সাজা মুখখানার পাশে ননীর মুখটা বসাতে। কিছুতেই মনে ধরাতে পারলো না।

ননীর মুখটা পৃথিবীর।

এ মুখটা আকাশের।

কিন্তু কমলার এই মুখখানা? এ মুখটা পৃথিবীর মাটির আদল ভুলে এমন আকাশের হয়ে উঠলো কোন মন্ত্রে?

নীহারকণা লেস বুনছিলেন।

সায়ার লেস।

বিধবা নীহারকণা নিজে লেসদার সায়া পরেন না, বাড়িতে দ্বিতীয় আর মেয়েমানুষও নেই, তবু অবকাশ হলেই সায়ার লেস বোনেন তিনি। হ্যাঁ এই একটা বুনুনিই শিখেছিলেন নীহারকণা, কবে যেন কার কাছে, আর তদবধি তিনি অবিরত এই একটি কাজ করে চলেছেন, ভাল ভাল রেশমী সুতো আনিয়ে। আর মাদুর গোটানোর মত করে গুটিয়ে গুটিয়ে বাক্স ভরতি করে জমিয়ে তুলছেন সেই লেসের পাহাড়।

কেন?

বিরাট এক আশার পাহাড় গড়া আছে যে নীহারকণার মনের মধ্যে।

ফুটফুটে সুন্দর একটি বৌ আসবে এ ঘরে, সব সময় শুধু সেজে গুজে হেসে খেলে বেড়াবে সে, আর নীহারকণা তার জন্যে রাশি রাশি লেস্-বসানো সায়া তৈরি করবেন। কেনা জিনিস দিয়ে বাক্স ভরানো যায়, মন ভরানো যায় কি?

কিন্তু কোথায় সেই বৌ?

বৌ আসার আশা ক্রমশই যেন ঝাপ্‌সা হয়ে আসছে।

যাকে নিয়ে বৌ আনার স্বপ্নসাধ, নীহারকণার এই সাধে সে বাদ সাধছে। বিয়ে করতে আদৌ রাজী নয় সে।

আর যতই সে তার প্রতিজ্ঞায় অটল হয়, ততই নীহারকণা চোখ ঠিক্‌রে লেস বোনেন।

আজ ও সেই লেস বুনছিলেন।

চাকর জগবন্ধু এসে দাঁড়ালো।

'পিসিমা!'

নীহারকণা চোখ না তুলেই বললেন, 'কেন, কী দরকার?'

'ছুটো মেয়েছেলে আপনার খোঁজ করছে।'

'মেয়েছেলে!'

নীহারকণার একাগ্রতা ভঙ্গ হলো।

'কী রকম মেয়েছেলে?'

'মানে আর কি···ইয়ে মতন!'

জগবন্ধু বোধকরি যাচ্ছিল ঘর মুছতে, হাতে জলের বালতি। মুখটা বেজার বেজার। সেই বেজার মুখটা আরও বেজার করে বলে, 'এই যারা সব ভিক্ষে সাহায্য চাইতে আসে, তেমনি ধারা। একটা গিন্নীমতন, একটা কম বয়সী।'

নীহারকণা বিরক্তভাবে বললেন, 'তবে আবার ঘটা করে বলতে এসেছিস কেন? ভাগাতে পারিসনি?'

'বললো সাহায্য চায় না, শুধু দেখা করতে চায়।'

সাহায্য চায় না! শুধু দেখা করতে চায়!—কেন?

নীহারকণা ভুরু কুঁচকে বিরক্ত মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বলেন, 'শুধু দেখা করে আবার তার কি চতুর্বর্গ লাভ হবে? কই কোথায় তারা?'

জগ হাতের জলের বালতিটা ছুম করে নামিয়ে গম্ভীর চালে বলে, 'ওই যে মাঝ সিঁড়িতে দাঁড়া করিয়ে রেখেছি। আপনাকে না বলে তো আর হুট্ করে কাউকে ওপরে তুলতে পারিনে পিসিমা।'

'পারিসনে বুঝি? তবু ভাল!' নীহারকণা বলেন, 'তা'হলে তো দেখছি আশী বছর না হতেই সাবালক হয়ে গেছিস তুই। নে ডাক দিকি, কাকে কোথায় দাঁড়া করিয়ে রেখেছিস। সাহায্য চায় না, শুধু দেখা করবে! হুঁ! ও আর এক রকম চালাকি, বুঝলি? অনেক

বাড়িতে তো সাহায্য চাইলে দেখাই করে না কিনা! ওইযে বলছিস সঙ্গে কমবয়সী মেয়ে রয়েছে, নিশ্চয় ওই মেয়ের বিয়ের ছুতো করে টাকা চাইবে!'

'হরিবোল হরি, কী বলেন গো পিসিমা! মেয়ের মাথায় যে টকটক করছে সিঁদুর, সঙ্গে একটা এইটুকুনি বাচ্চা। মনে নিচ্ছে, অন্য কোন বিপদে পড়ে এসেছে। আচ্ছা, ডাকি-ই না বাপু, হাতে পাঁজি মঙ্গলবারে কাজ কি।'

'হরেকেষ্ট! এই যে এঁরা উঠেই এসেছেন। ও গো বাছা এই ইনিই হচ্ছেন বাড়ির গিন্নী বুঝলেন? ওই যে 'পিসিমা' বলছিলাম না? ন্যান, দেখা করিয়ে দিলাম।'

জগ আবার জলভরা বালতিটা তুলে নিয়ে দুমদুম করে চলে যায়। আর পিসিমা থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন হাঁ করে।

না, এহেন ভদ্রমহিলার আবির্ভাব আশা করেননি তিনি। ভেবে ছিলেন আধা-ভিখিরী গোছেরই কেউ হবে। জগর মুখে 'আপনি' শুনেই অবাক হয়ে তাকিয়ে থতমত খেয়ে গেলেন।

আধা-বয়সী একটি শুভ্র থান পরিহিতা বিধবা, জীর্ণ হলেও পরিচ্ছন্ন একখানি সিল্কের চাদর গায়ে, নিরাভরণ দু'খানি হাত জড়সড় করে বুকের কাছে রাখা, মুখের রেখায় রেখায় একটি ক্লান্ত বিষণ্ণতা। তারই পিছনে একটি সুশ্রী সুঠাম তরুণী মেয়ে, নিতান্ত সাদাসিধে সাজ, নিটোল সুগোল মণিবন্ধে একগাছি করে সরু বালা মাত্র। তার মুখের চেহারা আরো বিষণ্ণ, আরো ক্লান্ত, আরো স্তব্ধ। মাথাটা ঈষৎ নিচু করে দাঁড়ানোর দরুনই বোধকরি অপরাহ্নের আলোতে সরু সিঁথির উপর টানা সিঁদুরের রেখাটি এত স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ছে। এক হাতে মেয়েটির একখানা হাত শক্ত করে ধরে আর অন্য হাতের আঙুলগুলো মুখের মধ্যে পুরে দাঁড়িয়ে আছে একটি বছর দেড়েকের রোগা গড়নের

ফর্‌সা ছেলে।

পথে পথে ঘুরে কেঁদে পড়ে সাহায্য চেয়ে যারা বেড়ায়, এরা যে সে শ্রেণীর নয়, তা এক নজরেই বোঝা যায়।···কিন্তু তা'হলে কি?

তা'হলে কেন এই ম্লান বিষণ্ণ স্তব্ধ ভঙ্গি?

'—কে গা বাছা তোমরা?'

স্বভাববহির্ভূত নরম গলায় বলেন নীহারকণা।

সত্যি নরম গলায় কথা বলা নীহারকণার প্রায় কুষ্ঠিতেই লেখে না। বড়লোকের মেয়ে, নিতান্ত অল্পবয়সে বিধবা। চিরদিনই কেটে গেল পিত্রালয়ের আরাম-ছায়ায়। আর ষোল আনা দাপট করেই এলেন চিরকাল। স্নেহময় বাপ বিধবা মেয়ের হৃদয়ের শূন্যতা পূর্ণ করতে বরাবর তাঁকে দিয়ে এসেছিলেন সংসারের একাধিপত্য কর্ত্রীত্ব।

এখন বাপ গেছেন, কিন্তু অনুগত ভাই আছেন।

বুড়ো হয়ে গেলেন, এখনো চন্দ্রনাথ দিদির কথায় ওঠেন বসেন, দিদির চোখেই জগৎ দেখেন, দিদিকে যমের মত ভয় করেন।

কেন?

তা জানেন না চন্দ্রনাথ। আশৈশব দেখে আসছেন দিদির ইচ্ছেই সংসারে শেষকথা। দিদিকে মান্য করে চলা ছাড়া অন্য কিছু সম্ভব, একথা চন্দ্রনাথ জানেন না।

বালবিধবা নীহারকণার ভাগ্যটা এ বিষয়ে এমনই জোরালো যে, যে-মানুষটা চন্দ্রনাথের এই 'দিদিভক্তি'তে জ্বলে পুড়ে মরতো, বাড়িসুদ্ধ লোকের নীহারকণার প্রতি এই অকারণ বাধ্যতায় থেকে থেকে বিদ্রোহ করে বসতো, সে বেচারা আস্ত মানুষ হয়ে ওঠবার আগেই মরে গেল।

'নগরে উঠতে না উঠতেই বাজারে আগুন লাগলো' চন্দ্রনাথের।

দু'বছরের মাতৃহীন ছেলেটাকে নিয়ে আরো বেশি করে দিদির

মুখাপেক্ষী হয়ে পড়লেন চন্দ্রনাথ।

যাক, সে অনেক দিনের কথা।

সেই ছেলে এখন বিদ্বান হয়েছে, কৃতী হয়েছে। রাজপুত্রের মত রূপবান স্বাস্থ্যবান ছেলে। তবে তার উপরও সমান দাপট নীহারকণার, কাজেই নরম গলায় কথা নীহারকণা দৈবাৎ ক'ন। আজ কেন কে জানে এদের দেখে নীহারকণার কেমন একটা অস্বস্তি হল, গা-টা কেমন ছমছম করল, ওই বিষণ্ণ দুটি মুখ দেখে কেমন সমীহ হল।

বললেন, নরম গলাতেই, 'আমার কাছে কী দরকার তোমাদের বাছা?'

বিধবা মহিলাটি ম্লান গলায় বলেন, 'আমি—মানে—ইন্দ্রনাথের মা-র সঙ্গে একটু দেখা করতে চাইছিলাম।'

'ইন্দ্রনাথের মা!'

নীহারকণা সচকিতে তাকিয়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলেন, 'ইন্দ্রনাথ! ইন্দুকে, ইয়ে, ইন্দ্রকে তুমি জানো নাকি?'

'জানি।'

মাথাটা আর একবার হেঁট করেন মহিলাটি।

'জানো? বলি কেমন ভাবে জানো? কী সুবাদে?'

নিজস্ব কণ্ঠের প্রশ্ন এবার নীহারকণার।

মহিলাটি যেন অসতর্কে একবার পশ্চাদ্‌বর্তিনীর দিকে চকিতদৃষ্টি ফেলে বলেন, 'সে কথা ইন্দ্রনাথের মা-র কাছেই বলতাম।'

'বটে!'

নীহারকণার মুখে একটি তিক্ত-কঠিন হাসি ফুটে ওঠে। সেই হাসি হেসে বলেন, 'তা খুব জরুরী কথা বোধ হয়? তাড়াতাড়ি বলতে হবে?'

'যত তাতাতাড়ি হয়!' মহিলাটি কম্পিত স্বরে বলেন, 'ঈশ্বর জানেন যে করে এসেছি!'

'বেশি তাড়াতাড়ি থাকলে'—নীহারকণা গম্ভীরকণ্ঠে বলেন, 'শীগ্‌গির কাজ দেয় এরকম খানিকটা বিষ এখুনি খেয়ে ফেলতে হয়, যাতে চটপট তার কাছে পৌঁছে যেতে পার। এ ভিন্ন আর কোন উপায় দেখি না।'

হ্যাঁ, নীহারকণার কথার ধরনই এই রকম।

মহিলাটি এই অদ্ভুত কথায় প্রথমটা চমকে গেলেন, তারপর অর্থটা বুঝে ফেলে কালিবর্ণ মুখে বলেন, 'ওঃ, তিনি নেই বুঝি ?'

'যাক বাছা, তবু বুঝলে। বলি ইন্দ্রনাথকে জানো, আর দু'বছর বয়সে তার মা মরেছে—তা জানো না ? তোমাদের রকম-সকম আমি বুঝতে পারছি না বাপু।'

এবারে তরুণীটি মুখ তোলে।

আর তার সেই অশ্রুছলছল চোখ দেখে নীহারকণা আর একবার একটু থতমত খান।

তরুণীটি মুখ তোলে বটে, কিন্তু কথা কয় নিজের মা-র উদ্দেশেই।

'মা, উনি পিসিমাকেই মা বলতেন!'

হ্যাঁ, তা অবশ্য বলে ইন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে। সাধ করে বলে। নীহারকণাও জানেন। কিন্তু সে কথা চুলোয় যাক,—উনি মানে!

মেয়েটার মুখের এই 'উনি' শব্দটা নীহারকণার কানে বিষবাণের মত লাগল।

এদের ভাবভঙ্গিতে কী যেন একটা ভয়ংকরতার আভাস। তাই সহসা সবলে নিতান্ত কঠোর হয়ে উঠলেন নীহারকণা। রূঢ় স্বরে বললেন, 'ইন্দু পিসিকে মা বলে, কি খুড়োকে মেসো বলে, সে কথা তোমার কানে ধরে কে বলতে গেছে বলতো বাছা ?'

মেয়েটি ফের মাথা নিচু করল।

গালের উপর গড়িয়ে পড়ল দুটি মুক্তার ধারা।

বিধবা ভদ্রমহিলাটিও এবার একটু কঠিন হলেন। কঠিন না হোক দৃঢ়।

বললেন, 'কে বলতে গেছে, সেইটুকু বলতেই তো আসা দিদি! বলতেই হবে আমাকে। নইলে শুধু শুধু আপনাকে জ্বালাতন করতে আসবো কেন? কিন্তু সে কথা তো এই সদরে দাঁড়িয়েই বলবার নয়।'

নীহারকণা রুক্ষভাবে বলেন, 'সদরের লোক সদরে দাঁড়িয়েই কথা কওয়ার রীত, খামোখা অন্দরেই বা নিয়ে যাবো কেন তোমাদের?'

মহিলাটি বোধকরি এবার বিচলিত হলেন।

বিচলিত স্বরেই বললেন, 'খামোকা অকারণ সে আবদার আমি করবোই বা কেন বলুন? নেহাৎ নিরুপায় বলেই, এই মেয়ে নাতি নিয়ে ছুটে এসেছি। তবে দরকার শুধু একা আমারই নয়, আপনাদেরও। তাই বলছি—মাথা ঠাণ্ডা করে সব শুনতেই হবে আপনাকে।'

'শুনতেই হবে! তবে আর কথা কি আছে? নীহারকণা বলেন শুনতেই যখন হবে, তখন এসো আমার ঘরে। কিন্তু তোমাদের মতলব আমি বুঝতে পারছিনে বাপু।'

ঘরের দিকে এগিয়ে যান নীহারকণা।

মহিলাটিও পিছু ধরে ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েকে উদ্দেশ করে বলেন, 'আয়।'

'আমি এখানেই থাকি না মা।'

মেয়েটির কণ্ঠে অসহায় মিনতি।

'ওখানে আবার একা দাঁড়িয়ে থাকবি কোথা? চারদিকে চাকর-বাকর ঘুরছে। চলে আয়।'

মার্জিত খোলশের ভিতর থেকে যেন চকিতে একটা অমার্জিত স্থূলতা উঁকি মারে।

নীহারকণা নীরস ভাবে বলেন, 'থাকতে ইচ্ছে হয় থাকো, আসতে

ইচ্ছে হয় এসো। আমার বাড়ির চাকর-বাকর এমন জানোয়ার নয় যে, তোমাকে একলা দেখলেই অমনি গিলে ফেলবে।'

'চাকর বাকর তেমন নয়?' মহিলাটির মুখে একটি সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ হাসি ফুটে ওঠে,—'তবু ভাল।'

নীহারকণার চোখ এড়ায় না এ হাসি, তিনি বিরক্ত ভাবে বললেন, 'হাসবার কী হলো বাছা? তোমার তো কথার ধরন ধারণ ভাল নয়?'

মহিলাটি কিন্তু দমেন না, তেমনি ব্যঙ্গের ভঙ্গিতেই বলেন, 'ভাল ভাল কথা আর শিখবো কোথা থেকে বলুন? আর শিখতে পারলেই বা গরিবের মুখে সেকথা মানাবে কেন? ভাল ঘরের মানুষরাই গরিব মজাবার জন্যে ভাল ভাল কথার চাষ করে থাকেন। আর সেই কথার ফাঁদে পড়ে গরিবকে আবার সেই আপনাদের দরজাতেই ছুটে আসতে হয়।'

চিরনির্ভীক নীহারকণা সহসা যেন ভয় পান।

এ কোন্ ধরনের কথা? কে এই মেয়েমানুষটা? কিসের সাহসে ওর মুখে ওই ব্যঙ্গের হাসি? আর নীহারকণাই বা সাহস পাচ্ছেন না কেন ওই ধৃষ্ট মেয়েমানুষটাকে দ্বারোয়ান দিয়ে দূর করে দিতে? কোন অদৃশ্যলোক থেকে—কে—নিয়ন্ত্রণ করেছে নীহারকণাকে?

নীহারকণা ভয় পেয়েছেন, তবু স্বভাবগত বাচনভঙ্গি ঠিকই বজায় রয়েছে। ভুরু কুঁচকে বলে ওঠেন তিনি, 'হেঁয়ালি থাক বাছা, যা বলতে চাও বলে ফেল চটপট।'

'চটপট বলে ফেলবার কথা হলে তো বলেই ফেলতাম, কিন্তু তা নয় বলেই আপনাকে কষ্ট দেওয়া।...একটু অন্তরালে যেতে হবে।'

'অন্তরালে!'

নীহারকণার বুকটা কেঁপে ওঠে।

আশ্চর্য!...এমন করে ভয় পেয়ে বসলো কেন তাঁকে? তবু তিনি মুখে সাহস দেখিয়ে ফের ভুরু কোঁচকালেন,—'অন্তরালে মানে?'

'মানে বলেছিই তো, দরদালানে দাঁড়িয়ে বলবার মত কথা নয়, তাই।'

নীহারকণা বলতে পারলেন না, তবে যাও বিদেয় হও। প্রথমেই এসে ইন্দ্রজিতের নাম করে এরা যেন কাবু করে ফেলেছে তাঁকে। তাই নীরস স্বরে বললেন, 'তবে চল ঘরের মধ্যে। এমন অনাছিষ্টি আবদারও শুনিনি কখনো।'

এঁরা ঘরে ঢোকেন, ছোটছেলেটার হাত ধরে মেয়েটিও অগত্যাই যেন মার পিছন পিছন ঢোকে।

ঘরে ঢুকে নীহারকণা কী ভেবে একটু ইতস্ততঃ করে দরজার পর্দাটা টেনে দিলেন।

কে জানে কোন্ রহস্য উদ্ঘাটিত হবে সেই পর্দার ওপিঠে।

'তার মানে ?'

ইন্দ্রনাথ গায়ের ভারী পোশাকগুলো খুলে ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতে বলে, 'ভায়া জগবন্ধু, তুমি যে রহস্য হয়ে উঠছ! পিসিমা আবার ঘরে পর্দা টেনে কার সঙ্গে গোপন পরামর্শ করছেন ?'

'জানিনে দাদাবাবু।'

জগ ছড়ানো পোশাকগুলো কুড়িয়ে জড়ো করতে করতে সন্দিগ্ধ-ভাবে বলে, 'মনে হচ্ছে কিছু একটা ব্যাপার ঘটছে।'

'তোর মনের মধ্যে তো সর্বদাই যত সব ব্যাপার ঘটছে।'

ইন্দ্রনাথ ধপাস্ করে ডান্‌লপের গদি-দেওয়া বিছানাটার ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে পা নাচাতে নাচাতে বলে, 'আপাতত চায়ের ব্যাপারটি ঘটাও দেখি। যতদূর দেখছি, পিসিমাকে এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না। নির্ঘাত ওঁর সেই সইয়ের মায়ের গঙ্গাজলের বোনপো বোয়ের বকুলফুল-টুল এসেছে। একজন বুড়ি, একজন মেয়েমানুষ আর একটা বাচ্চা বললি না ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, দাদাবাবু।'

'ব্যস্ ব্যস্, ঠিক আছে।' সদা-হাস্যময় ইন্দ্রনাথ গুনগুন করে এককলি গান গেয়ে বলে ওঠে, 'এ আর কেউ নয়, সেই বোনপো বোয়ের কদমফুল আর তার ছেলে-মেয়ে। পিসিমা আজ একেবারে গেলেন! আর কিছু নয়, বুঝলি জগ, নিশ্চয় কিছু বাগাতে এসেছে। নইলে দশ পাঁচ বছর পরে কেউ কখনো খুঁজে খুঁজে পুরনো আলাপীর বাড়ি আসে ?'

'পুরনো আলাপী-টালাপী কিছু না,' জগবন্ধু ইন্দ্রনাথের খাটের বাজুগুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলে, 'পিসিমা সাতজন্মেও চেনেনা ওদের। তাছাড়া সাহায্য-টাহায্য চায় না তেনারা।'

'চেনা নয়? সাহায্য নয়?' ইন্দ্রনাথ হেসে উঠে বলে, 'তবে বোধহয় আমার বিয়ের সম্বন্ধ করতে এসেছে?'

'তা হতে পারে!' জগ লাফিয়ে ওঠে।

'ঠিক বলেছেন! হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই সম্ভব।'

এতক্ষণে যেন দম নেয় জগ। আর পরক্ষণেই মনে মনে জিভ কাটে, সর্বনাশ! তাই যদি হয়, তাহলে তো জগ মরেছে। মাঝসিঁড়িতে দাঁড়া করিয়ে রেখেছিল ওদের জগ। ছি ছি! কে জানে যদি এর পর ওনাদের সঙ্গেই কুটুম্বিতে হয়! জগ তার এই কেলে মুখখানা তাহলে লুকোবে কোথায়!

ইন্দ্রনাথ স্নান সেরে পরিপাটি পরিচ্ছন্ন হয়ে চায়ের টেবিলে বসে বলে, 'বাবা এখনো ফেরেননি রে জগ?'

'না। বাবু যে আজ বলে গেছেন শিবপুর যাবেন, দেরি হবে।'

'তাই নাকি! তা পিসিমার সেই গঙ্গাজল না গোলাপফুল চলে গেল, না এখনো বসে আছে দেখগে দিকি!'

'বসে আছে, এই তো দেখে এলাম ঘরে পর্দা ফেলা।'

'স্ট্রেঞ্জ!' বলে আপন মনের অকারণ আনন্দে গান গাইতে গাইতে খাবারের থালা শেষ করতে থাকে ইন্দ্রনাথ। স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে না পিসিমার ঘরে কী নাটকের অভিনয় চলছে।

খেয়েদেয়ে গুন গুন করতে করতে বেরিয়ে গেল সে, যথারীতি যথাবিধি।

'দিদি ! কী বলছো তুমি ?'

চন্দ্রনাথ কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন।

নীহারকণা ভাইয়ের এই বিপর্যস্ত ভাব দেখে ব্যস্ত হলেন। এ অন্য ব্যাপার নয় যে মুখঝামটা দিয়ে বলবেন, মেয়েলিপনা করিসনে চন্দর। ব্যাটাছেলে, তবু দশহাত কাপড়ে কাছা নেই !

কিন্তু এ একেবারে ধারণাতীত ব্যাপার।

নীহারকণা নিজেই কি কম বিপর্যস্ত হয়েছিলেন ? যারা এই বিপর্যয়ের কারণ, একবার তাদের দরোয়ান দিয়ে বার করে দিতে চেয়েছেন, তখুনি তাদের মিনতি করেছেন গোলমাল না করতে। একবার বলেছেন, 'তোমাদের মত মেয়েমানুষ ঢের দেখা আছে আমার। এখানে জোচ্চুরি করে পার পাবে না, হাতে দড়ি দিয়ে ছাড়বো।' আবার তখুনি তার আঁচলে জোর করে নোটের গোছা বেঁধে দিয়েছেন 'মিষ্টি খেও' বলে।

প্রত্যয় আর অপ্রত্যয়ের যুগল রজ্জুর দোলায় দুলতে দুলতে শেষ পর্যন্ত রক্তাক্ত হৃদয়ে প্রত্যয়ের দড়িটাকেই মুঠিয়ে ধরেছেন নীহারকণা।

এখন চিন্তা,···অতঃপর কী ?

মাথা খুঁড়ে মরতে পারলেই বুঝি সবচেয়ে ভাল হতো তাঁর।

ছি ছি ছি !

যা কল্পনার অতীত, ধারণার অতীত, বিশ্বাসের অতীত, তাই সংঘটিত হয়েছে তাঁরই বড় আদরের, বড় স্নেহের, বড় বিশ্বাসের ইন্দুকে দিয়ে।

ওই সরলতার ছদ্মবেশী আধারে এত গরল !

নীহারকণার হৃদয়কক্ষে তাঁর ইষ্টদেবতা বালগোপালের মূর্তিরও উপরে যার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত, নিষ্পাপ নির্মল দেবমূর্তির মতই যে

মূর্তিখানি, সেই মূর্তির মধ্যে লুকোন আছে—এই শয়তান বদমাইশ।

ফুলের মধ্যে সাপ!

ইন্দ্র মস্ত একটা ভুল করে ফেলেছে, কি ভয়ানক একটা কুকর্ম করে ফেলেছে বলে যতটা মর্মাহত হয়েছেন নীহারকণা, তার চাইতে শতগুণ মর্মাহত হয়েছেন এই দেখে যে, সেই পাপ সে এই দীর্ঘকাল ধরে নীহারকণার কাছে পর্যন্ত গোপন করে এসেছে।

যতবার ভাবছেন ইন্দু তাঁকে ঠকিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে ঠকিয়ে আসছে, ততই বুকটা ফেটে যাচ্ছে নীহারকণার। ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে, নিজের চুলগুলো মুঠিয়ে ধরে ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে, ইচ্ছে করছে সেই মহাপাতকী আসামীটাকে দু'হাতে ধরে সজোরে নাড়া দিয়ে দিয়ে বিষ-তীব্র তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করতে—'ওরে তোর মনে এত ছলনা? তোর মনে এত কালকূট? বংশের মুখে চুনকালি লেপে, বাপ-পিসির গালে চড় মেরে এই কীর্তিটা করে দিব্যি বুক বাজিয়ে আহ্লাদে গোপাল সেজে মায়া কাড়িয়ে বেড়াচ্ছিস? ওরে হতভাগা, এতটা বুকের পাটা তুই পেলি কোথায়?'

কিন্তু আপাতত সেই পাপিষ্ঠকে হাতের কাছে পাওয়া যাচ্ছে না। বাবু নাকি চাকর-বাকরদের বলে গেছে ফিরতে দেরি হবে—ক্লাবে ফাংশন আছে। কক্‌খনো তা নয়, নীহারকণা মনে মনে যেন বাতাসের উদ্দেশ্যেই কটূক্তি করেন,…ফাংশন না হাতী! বুঝি না কিছু আমি? নিশ্চয় টের পেয়েছিস তুই হাটে হাঁড়ি ভেঙেছে। তাই মনে করেছিস —যত দেরি করে ফিরতে পারি। কেমন? কিন্তু সে আশা ছাড় তুমি। সমস্ত রাতও যদি বাড়ি না ফেরো, তোমার এই দজ্জাল পিসিটি সমস্ত রাত জেগে বসে পাহারা দেবে।

হেস্তনেস্ত তো করতেই হবে একটা।

যাক, আপাতত সে না থাকুক তার বাপ আছে।

চন্দ্রনাথ ভয়ে ভয়ে বলেন, 'দিদি, আমার মনে হয় এসব কোন ষড়যন্ত্র। ইন্দ্র এলে তাকে জিগ্যেস করে'—

নীহারকণা গম্ভীরভাবে বলেন, 'ইন্দ্র এলে তাকে জিগ্যেস করতে হবে, এ কথা আর তুই আমাকে শেখাতে আসিসনে চন্দর। জিগ্যেস করা কাকে বলে, জেরা করা কাকে বলে, সে আমি বাছাধনকে বুঝিয়ে ছাড়বো। তবে অবিশ্বাসের আর কিছু নেই। গোড়ায় আমিও ভেবেছিলাম ষড়যন্ত্র। তাদের গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দিতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু মেয়েটা যখন ইন্দু হতভাগার ফটোখানা বার করে দেখাল, তখন আর অবিশ্বাসের রইল কী! মাথা হেঁট হয়ে গেল আমার। আদর করে তার সঙ্গে আবার নিজের ফটো তোলা হয়েছে। কিন্তু ভাবছি, আজকালকার ছেলেপুলে কী সর্বনেশে চীজ্! এদের যে চিনতে পারবে, সে এখনো তার মাতৃগর্ভে আছে। কচি ছেলেটার মতন হাবভাব তোর, এখনো 'পিসি' বলে কোল ঘেঁসে বসিস, আর তুই কিনা তলে তলে এই কীর্তি করেছিস।…বিয়ে করেছিস, ছেলের বাপ হয়েছিস, এতগুলো দিন সে সব কথা লুকিয়ে রেখেছিস! ওরে বাবারে!…ভাবছি আর বিষ খেয়ে মরতে ইচ্ছে করছে আমার!'

চন্দ্রনাথ ভয়ে ভয়ে বলেন, 'দিদি, চাকর-বাকররা শুনতে পাবে'।

তারা শুনতে পাক, এ বাসনা অবশ্য নীহারকণারও নেই, তবু জেদের সুরে বলেন, 'পাক না। এর পর যে জগৎ শুনবে। কার শুনতে বাকি থাকবে? ওই বৌ নাতিকে মাথায় করে নিয়ে এসে বরণ করে ঘরে তুলতে হবে না?'

চন্দ্রনাথ বোধকরি মরিয়া হয়েই আজ দিদির প্রতিবাদ করে ফেলেন।

বলেন, 'কী যে বলো দিদি! এখন রাগের মাথায় যা নয় তাই বলছো বলেই কি আর—'

'যা নয় তাই মানে?' নীহারকণা বজ্রগর্ভ স্বরে বলেন, 'নীহারকণা

কখনো 'যা নয় তাই' বলে না চন্দর। যা হয়, তাই বলে। রেজেস্টারী-মেজেস্টারী নয়, অগ্নি-নারায়ণ সাক্ষী করে স্বজাতির মেয়ের সঙ্গে বামুন-পুরুত ডেকে বিয়ে, এ তো আর রদ হবার নয়? বৌকে গ্রহণ করতেই হবে।...তার ওপর পেটে একটা জন্মেছে।'

চন্দ্রনাথ কাঁদো কাঁদো গলায় বলেন, 'কিন্তু আমি ভাবছি দিদি, এ কখনো সত্যি হতে পারে?...এ কাজ ইন্দ্র করতে যাবে কেন?'

'কেন?'

নীহারকণা ভয়ংকরী মূর্তিতে বলেন, 'কেন, তা কি আবার তোকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে চন্দর? বিয়ের বয়েস পার হতে চললো ছেলের, তুই বাপ, এখনো নাকে সর্ষেতেল দিয়ে বসে আছিস। উড়ুক্কু মন নিয়ে এদিক-ওদিক ঘোরে, অসাবধানে ডাকিনীর ফাঁদে পা দিয়ে বসে আছে। আগে বলিনি তোকে আমি, ছেলের এত পরোপকারে মতিগতি কেন চন্দর? সামলা ওকে!...বাপের পয়সা আছে, নিজে তিন চারটে পাস করে মোটা মাইনের চাকরি করছিস, হাসবি খেলবি গাইবি বাজাবি, ডানাকাটা পরী খুঁজে এনে বিয়ে দেব, ঘর-সংসার করবি, তা নয়, কোথায় বুড়ো দামড়াদের জন্যে নাইট ইস্কুল করছে, কোথায় যত রাজ্যের কলোনি-মলোনিতে ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াচ্ছে—কে ঘর পাচ্ছে না, কে রোগে ওষুধ পাচ্ছে না, কে জলকষ্টে মরছে। কেন?...সুখে থাকতে এ ভূতের কিল খাওয়া কেন বাপু? তা না, বাপ হয়ে তুই তখন দিব্যি গা এলিয়ে দিলি 'আহা করছে করুক, সৎকাজ।' এখন বোঝ সৎকাজের ঠ্যালা! চিরকেলে কথায় কাছে—ঘী আর আগুন!'

চন্দ্রনাথ শেষবারের মত সন্দেহ ব্যক্ত করেন, 'যতই হোক, এ আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিনা দিদি—ইন্দ্র লুকিয়ে বিয়ে করবে! আর সে কথা তোমার কাছে সুদ্ধু গোপন করে রাখবে!'

হঠাৎ প্রবল আলোড়নে এক ঝলক অশ্রু এসে পড়ে নীহারকণার

জ্বলন্ত চোখ দুটোয়।

এতক্ষণে গলাও ধরে আসে।

'সেই দুঃখেই গলায় দড়ি দিয়ে মরতে ইচ্ছে করছে রে চন্দর। করলি করলি আমায় কেন জানালি না ? হোক গরিব, হোক বিধবার মেয়ে, না হোক তেমন সুন্দরী, তবু আমি তত্ত্বতালাশ করে পানপত্তর পাকাদেখা করে লোক জানিয়ে বিয়ে দিতাম। না হয় আত্মকুটুম্বকে বলতাম, গরিবের মেয়ে উদ্ধার করছি। এ আমাকে ভয় করতে গিয়ে যে আমারই গালে মুখে চুনকালি দিলি !'

'কত দিন এ কাজ হয়েছে ?' মরমে মরে গিয়ে বলেন চন্দ্রনাথ।

'মাগী তো বললো দু তিন বছর। ছেলেটাও তো দিব্যি বড়সড়, কোন না বছর খানেকের হবে।'

চন্দ্রনাথ নিশ্বাস ফেলে বলেন, 'কলকাতা শহরে কত ঠগজোচ্চোর আছে। তাই বলছি—ছেলেটাকে কি ইন্দ্রর বলে মনে হলো দিদি !'

মেয়েমানুষের মতই কাপড়ের খুঁটে চোখ মোছেন চন্দ্রনাথ।

'অবিকল চন্দর, অবিকল ;' নীহারকণা রায় দেন, 'ঠিক ইন্দু ছোটবেলায় যেমনটি ছিল। রোগা রোগা ফরসা ফরসা ! ঠিক তেমনি একমাথা চুল।'

আর সন্দেহের কী আছে ?

চন্দ্রনাথ যেন কথা খুঁজে না পেয়েই অন্যমনস্কভাবে বলেন, 'মেয়েটা কি খুব সুন্দর ?'

'বললাম তো সবই। রূপ আছে। কিন্তু অমন রূপসী কি আমার ইন্দুর জুটতো না ?'

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা।

চন্দ্রনাথ কতক্ষণ ইতস্ততঃ করে বলে ফেলেন, 'আচ্ছা দিদি, এমনও তো হতে পারে, ঝোঁকে পড়ে দৈবাৎ একটা দোষঘাট করে ফেলেছিল

ইন্দ্র, তাই এরা কায়দায় পেয়ে…মানে আর কি…বিয়েটা হয়তো হয়নি !'

নীহারকণা প্রবল বেগে মাথা নাড়েন।

'ছি ছি, ও কথা বলিসনে চন্দর। এ কথা ভাবলে ইন্দুর ওপর আরও অবিচার করা হবে। ইন্দু যত অকাজই করে থাকুক, এতবড় মহাপাতকীর কাজ কখনো করবে না।…না না, সে ডাকিনীদের চক্রে পড়ে বিয়েই করে বসেছে। তারপর ভয়ে কাঠ হয়ে বাড়িতে বলতে পারেনি !…ছুঁড়ির সিঁথেয় ডগডগ করছে সিঁদুর।'

'কিন্তু এতদিন কেন তাহলে ওরা নীরব ছিল ?' চন্দ্রনাথ যেন যুক্তি হাতড়ে বেড়ান।

'আহা, বললাম তো সবই। প্রথম প্রথম নাকি ইন্দু আসা-যাওয়া করছিল, তারপর অনেকদিন অবধি মাসোহারাও দিয়েছে, এখন আর খোঁজ-উদ্দিশ করে না। বাচ্চাটাকে নিয়ে ছুঁড়ি এখন উপোস করতে বসেছে। তাই মা মাগী ধরে-করে নিয়ে এসেছে।…ছুঁড়ি তো আসতে চায়নি, বলেছিল বুঝি 'তাঁর এই ফটোখানা বুকে করে ঘরে পড়ে শুকিয়ে মরবো সেও ভাল।' কিন্তু ওই যে পেটের শত্তুর! ওর জন্যেই আবার—'

চন্দ্রনাথ তাঁর ঊষর টাকে হাত বুলোতে বুলোতে ঘরে পায়চারি করছিলেন, এখন আবার দিদির কাছে সরে এসে যেন নিজের মনেই বলেন, 'কিন্তু মাসোহারা বন্ধ করে দেবে ইন্দ্র !…ইন্দ্রর দ্বারা এমন কাজ সম্ভব ?…যে ছেলে রাজ্যের দীনদুঃখী গরিব ফকিরকে মাসোহারা দিয়ে বেড়ায় ! যতই হোক, যখন বলছো নিজের স্ত্রী-সন্তান।'

'আহা বুঝছিস না ?' নীহারকণা চোখের কোণটা কুঁচকে, ঠোঁট টিপে বলেন, 'ওই ছুঁড়ি কি আর ইন্দুর যুগ্যি ? দয়ার শীরর ওর, গরিব দেখে দয়ায় পড়ে করে ফেলেছে কাজটা। এখন আর ভাল লাগছে না। এখন ঘাড় থেকে নামাতে চাইছে।…এখন সমযুগ্যি মেয়ে দেখে

বিয়ে করতে সাধ হয়েছে নিশ্চয় !'

হঠাৎ যেন বিনামেঘে বজ্রপাত হয়।

সুস্থির বসুমতীর বুক থেকে ভূমিকম্প ওঠে।

চিরদিনের মিনমিনে চন্দ্রনাথ চিৎকার করে ওঠেন, 'এত অধর্ম—আমি সইবো না।...তাকে আমি ত্যেজ্যপুত্তুর করবো !...ওকে আমি বাড়ি থেকে বার করে দেব।...আমার যথাসর্বস্ব রামকৃষ্ণ মিশনে দিয়ে দেব।...ওই কুলকলঙ্ক ছেলের মুখ আমি আর দেখবো না...'

ইন্দ্রনাথ যখন ফিরলো তখন অনেক রাত।

আজ তাদের 'সমাজকল্যাণ সঙ্ঘের' প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে বার্ষিক সম্মেলন ছিল। অনুষ্ঠানটা ভালই হলো। সভাপতি আর প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন সাহিত্যিক প্রবোধ ঘোষ আর কবি সুজিত দত্ত।

সমাজকল্যাণের নানা নতুন ব্যাখ্যা শোনালেন তাঁরা, আলোচনা করলেন নানা দিক থেকে। বললেন, সমাজকল্যাণের মূল বনেদ হচ্ছে মানবতাবোধ। মানুষ যেদিন সমস্ত মানুষকে মানুষ বলে স্বীকৃতি দিতে শিখবে, তখন আর আলাদা করে সমাজকল্যাণ সঙ্ঘ গড়তে হবে না। সেই মানবতাবোধ, আর সেই সমবোধের ভিত্তিতে যে সমাজ গঠিত হবে, সে সমাজে অকল্যাণের স্পর্শ থাকবে না।···ইত্যাদি ইত্যাদি। ধীরে সুস্থে চমৎকার করে বললেন। অথচ এদিকে প্রবোধ ঘোষ ভারী ব্যস্তবাগীশ। নিজের ভাষণটুকু শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সভা ত্যাগ করলেন, কারণ পর পর নাকি আরও দুটো সভা আছে। একটা কোন ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের, আর একটা কোন মহারাজজীর তিরোধান-দিবসের স্মৃতি-বার্ষিকী।

তিনটি সভা তিন জাতের।

কিন্তু তিনটেতেই সমান ভাষণ-নৈপুণ্য প্রকাশ করবেন প্রবোধ ঘোষ। আশ্চর্য!

কী করে যে পারে এরা!

কবি সুজিত দত্তর কথাগুলিতে একটু বেশী মাত্রায় ভাবোচ্ছ্বাস। কথার চাইতে কথার ফেনা-ই বেশি। তবু শুনতে ভাল।

অবিশ্যি যারা কান পেতে শুনতে চাইবে তাদের কাছে। নইলে বক্তৃতা আর কান দিয়ে শোনে কে?

কখন পশ্চাদ্বর্তী আকর্ষণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি শুরু হবে, শ্রোতারা তার জন্যে ছটফট করতে থাকে। বক্তারা সময় একটু বেশি নিয়ে ফেললেই মনে মনে তাঁদের মুণ্ডপাত করতে থাকে। হাসে, টিটকিরি দেয়, অলক্ষ্যে বক দেখায়।

ইন্দ্ররা তো সবই জানে।—সবই দেখে।

ওই জন্যেই তো অধ্যাপক সুকুমার বন্দ্যোর নাম উঠেও ভোটের অভাবে বাতিল হয়ে গেল! সঙ্ঘের অন্যেরা বললে, 'ও সর্বনাশ! সুকুমার! তাঁর তো সেই 'ধরলে কথা থামায় কে'! সুকুমারকে এনে মাইকের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে আজকের ফাংশনই মাটি। তিনি স্থান-কাল-পাত্র, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান, সব কিছু বিস্মৃত হয়ে তাঁর প্রাণের যত কথা, হৃদয়ের যত বক্তব্য সব প্রকাশ করতে বসবেন।'

কোন একটি বিখ্যাত মহিলাকে আনার ইচ্ছে ছিল সবাইয়ের, জোগাড় হলো না। মহিলাদের যে আবার মান বেশি! অনুরোধ উপরোধ করতে করতে প্রাণ যায়। তা ছাড়া আনতে যাও, রাখতে যাও, মহা ঝামেলা!

হঠাৎ একটা কথা মনে এসে বেদম হাসি পেয়ে গেল ইন্দ্রর।

আচ্ছা, পিসিমাকে যদি কোন স্টেজে তুলে মাইকের সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়? ভাবতে গিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে হেসেই ফেললো ইন্দ্র।

কথার তোড়ে একেবারে সভা ভাসিয়ে দিতে পারবেন পিসিমা। হ্যাঁ, সে ক্ষমতা তিনি রাখেন।

যে কোন সাবজেক্টেই হোক, পিসিমা হারবেন না।

ঠাকুরদা যদি লেখাপড়া শেখাতেন পিসিমাকে তো উনি হয়তো ম্যাজিস্ট্রেট হতে পারতেন, পারতেন দেশনেত্রী হতে। হয়তো দ্বিতীয় সরোজিনী নাইডু হতে পারতেন।

কিন্তু কিছুই হলেন না।

অল্পবয়সে বিধবা হয়ে একটি গৃহগণ্ডীর মধ্যেই নিজেকে ক্ষয় করে ফেললেন।

আমাদের দেশে জীবনের কী অপচয়!

আমাদের সমাজে মানুষ কী মুল্যহীন।

বাড়ির মধ্যে কী তুফান উঠেছে, নীহারকণা আর চন্দ্রনাথ কোন্ যন্ত্রনায় ছটফট করছেন, সে খবর নিচের মহলে পৌঁছয়নি। তাই নিত্য নিয়মে সব কাজ মিটিয়ে জগ, দারোয়ান আর ঠাকুর বাইরের দিকে প্যাসেজটার সামনে বসে তাস খেলছিল। ইন্দ্রনাথের ফিরতে রাত প্রায়ই হয়, তার খাবার ঢাকাই থাকে, এলে গরম করে দেওয়া হয়। যদিও এ সমস্ততে ইন্দ্রনাথের আপত্তি; সে বলে, 'কত লোকের পান্তা ভাতই জোটে না, আর একটু ঠাণ্ডা খাবারে এত ইয়ে।' কিন্তু তা'হলে হয় তো পিসিমা বাড়িসুদ্ধু সবাইকে না খাইয়ে সারা বাড়ি সজাগ করিয়ে রাখবেন। তার চাইতে এই রফা। খেয়ে নেবে সবাই, শুধু ইন্দ্রনাথ এলে তার আহার্য বস্তু গরম করে দেবে।

ইন্দ্রনাথ গাড়িকে একেবারে গ্যারেজে তুলে রেখে বাড়ি ঢোকে, গাড়ির চাবি নাচাতে নাচাতে মৃদুগুঞ্জনে গান গাইতে গাইতে। আজও তার ব্যতিক্রম হলো না।

ওকে দেখেই চাকররা উঠে দাঁড়ালো। তাসটা অবশ্য চাপা দেওয়া গেলনা। ইন্দ্র এক নজর দেখে হেসে উঠল—'কী বাবা, জুয়া-টুয়া চালাচ্ছো না কি? দেখো সাবধান! যা দেখছি, একেবারে ত্রিশক্তি সম্মেলন! একটি বঙ্গজ, একটি বেহারী, একটি উড়িষ্যা নন্দন। তা' জুয়া চালাচ্ছিস তো?'

'কী যে বল খোকাবাবু, জুয়া খেলতে যাবো কেন?'

'খেলতে যাবি কেন? হাঃ হাঃ হাঃ। সারা পৃথিবীটাই তো জুয়া খেলছে রে! ভগবান যে ভগবান, তিনিও মানুষগুলোকে নিয়ে জুয়া

খেলছেন। নাঃ, এসব দার্শনিক ব্যাখ্যা তোদের মাথায় ঢুকবে না। চলহে ঠাকুরচন্দ্র তোমার ডিউটি সারতে। ভীষণ অবস্থা, ঘরবাড়ি ইট পাটকেল খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে!'

ঠাকুর ত্রস্তে এগোতে গিয়ে আবার কী ভেবে দাঁড়িয়ে পড়ে।

আর জগ অপ্রসন্নভাবে তাসগুলো গোছাতে গোছাতে বলে, 'সঙ্ঘে যে এত ঘটাপটা হয়, তা কেউ কিছু খেতে দেয় না?'

'খেতে? বলিস কী? সে কি একটা-আধটা লোক? কাকে খাওয়াবে?'

'আহা রাজ্যিসুদ্দুকে কি আর গেলাবে? হচ্ছে তোমার কথা। তুমি হলে গে সেক্রেটারি!—নাও, এখন চটপট সেরে নাও গে। পিসিমা রেগে আছে।'

'রেগে আছেন? তুই বুঝি বলিসনি আমার দেরি হবে?'

জগ গম্ভীরভাবে বলে, 'বলবো আবার কখন? সেই মেয়েছেলে দুটো চলে যাওয়া ইস্তক পিসিমা কি ঘর থেকে বেরিয়েছে? এই এ্যাতো বড় মুখ করে ঘরের মধ্যে বসে আছে। তারপর বাবুর সঙ্গে কত কথা, কত সলা-পরামর্শ।'

ইন্দ্রনাথের সন্ধ্যার ঘটনার কথা মনে ছিল না। তাই অবাক হয়ে বলে, 'মেয়েছেলে আবার কে?'

'আহা, সন্ধ্যেবেলা যাদের নিয়ে দোরে পর্দা ঝুলিয়ে দু'ঘণ্টা কথা হলো পিসিমার।'

'ও আই সি!' ইন্দ্রনাথ বলে, 'কে তারা? পিসিমার শ্বশুরবাড়ির কেউ নাকি?'

'কে জানে বাবু!'

বলে ফের তাস ভাঁজতে শুরু করে জগ!

আর ঠাকুর জানায়, পিসিমার ঘরে দাদাবাবুর খাবার ঢাকা আছে।

খাবার ঢাকা!

ব্যাপার কী !

পিসিমা ঠাণ্ডা খাবার খাওয়াবেন ইন্দ্রকে !

কিন্তু আজ আর খাবার ঠাণ্ডার জন্য পিসিমার কোন আক্ষেপ নেই।

কারণ আজ তিনি এই তুচ্ছতার অনেক উর্ধ্বে।

ইন্দ্র বাড়ি আসবার আগে ভেবেছিল তার দেরির জন্যে পিসিমার রাগ এককথায় 'জল' করে দেবে। কিন্তু বাড়ি ঢুকে জগর আর ঠাকুরের মারফত রিপোর্ট পেয়ে কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত, কিঞ্চিৎ চিন্তিত হয়ে উপরে উঠল। আর নীহারকণার ঘরে ঢুকে ভয়ানক রকমের অবাক হয়ে গেল।

ইন্দ্রর মনে হল তার জীবনে সে আর কখনো পিসিমার মুখের এরকম চেহারা দেখেনি।

এ চেহারা কি রাগের, না অভিমানের ?

না, তাও তো নয়।

নীহারকণার চিরদিনের একরঙা মুখে অদ্ভুত এক ভাবব্যঞ্জনা। সে মুখে নানারঙের ছাপ—

রাগের, দুঃখের, ক্ষোভের, হতাশার, বেদনার, এবং আহত আত্মাভিমানের।

কিন্তু কেন ?

এই অভূতপূর্ব ভাবব্যঞ্জনার কারণ যে ইন্দ্র নিজেই, একথা ইন্দ্র ভাবতে পারলো না। তাই কাছে গিয়ে আস্তে প্রশ্ন করলো,—'পিসিমা এভাবে বসে যে ?'

নীহারকণা এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে শান্ত গম্ভীরভাবে বললেন, 'হাত মুখ ধোওয়া হয়েছে ?'

'হ্যাঁ।'

'খেয়ে নাও।'

সংক্ষিপ্ত স্নেহহীন এই নির্দেশটুকু দিয়ে নীহারকণা ইন্দ্রর জন্য রক্ষিত আহার্যগুলি গুছিয়ে টেবিলে দিয়ে দেন।

ইন্দ্র খেতে বসে বলে, 'বাবার খাওয়া হয়েছে?'

'না, সে আজ খায়নি।'

নীহারকণার স্বর উদাস।

'খাননি? কেন? অসুখ করেছে?'

নীহারকণা উদ্বেলিত আবেগ-তরঙ্গ কোন রকমে চেপে রেখে বলেন,...'অসুখ? হ্যাঁ তা অসুখ বৈকি। বলবো সবই, বলতে তো হবেই। আগে খেয়ে নাও।'

পিসিমার মুখে 'তুমি' সম্বোধন!

হঠাৎ বুকটা কেমন হিম হিম হয়ে আসে ইন্দ্রর। আর সঙ্গে সঙ্গে থালার কাছে বাড়ানো হাতটা গুটিয়ে নিয়ে বলে, 'শোনবার আগে তো খাবো না।'

নীহারকণা আরো উদাস, আরো শান্তভাবে বলেন, 'খাবার আগে তো শোনাব না।'

'পিসিমা, কী হয়েছে বল না? কেউ কোথাও মারা গেছে নাকি?'

'নাঃ, মরতে আর পারা গেল কই?' নীহারকণা তিক্ত ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে বলেন, 'শুধু মরার বাড়া হয়ে পড়ে থাকা!'

ইন্দ্র এবার ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

'দোহাই পিসিমা, সবাই মিলে এমন রহস্য হয়ে উঠো না তোমরা। জগাটাও কী যে সব মাথামুণ্ডু বললো! সন্ধ্যাবেলা এসেছিল কারা সব?'

আর চলে না।

আর ধৈর্য ধরে থাকা যায় না।

আর অপেক্ষা করা সম্ভব হয় না পরম স্নেহের ভাইপোর খাওয়া সাঙ্গ হওয়া পর্যন্ত।

ফেটে পড়লেন নীহারকণা।

'ঢের ছলনা করেছিস ইন্দু, আর ছলা-কলা করিসনে। মানুষের সহ্যের একটা সীমা আছে।'

'ছলনা!'

ইন্দু!···সহ্যের সীমা!

ইন্দুই কি আজকের এই দুর্বোধ্য রহস্য-নাটকের নায়ক নাকি?

কিন্তু ব্যাপার কী?

···ইন্দ্রনাথও সংহারমূর্তি ধরতে জানে। তাই চেয়ারটা ঠেলে খাবার টেবিল থেকে উঠে পড়ে বিরক্ত কণ্ঠে বলে, 'যাক, জানো তাহলে মানুষের সহ্যের একটা সীমা আছে? কিন্তু সেটা সব মানুষের পক্ষেই প্রযোজ্য পিসিমা। ঈশ্বর জানেন কী ঘটেছে তোমাদের সংসারে,···পরমাত্মীয় কেউ মরে গেছে, না নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, না কি তোমাদের ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে গেছে, না মামলায় সর্বস্বান্ত হয়েছ তোমরা। কিন্তু তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী? এমন ভাবে কথা বলছো যেন আমিই কি অপরাধ করেছি। মানে কী এর?'

'মানে কী এর!'

'মানে জানো না তুমি ইন্দ্রনাথবাবু? মানে বোঝবার ক্ষমতা হচ্ছে না তোমার?'

নীহারকণা যেন ধাপে ধাপে ফেটে পড়তে থাকেন, আরো বেশি—আরো বেশি।

'মানে বুঝছো না, তোমাকে কেন অপরাধী করা হচ্ছে?···লুকিয়ে লুকিয়ে বিয়ে করবার ক্ষমতা হয়েছে, বিয়ে হতে হতেই ছেলের বাপ হবার ক্ষমতা হয়েছে, এতবড় একটা কুকীর্তি করে দিব্যি গা ঝেড়ে ফেলে খোকা সেজে বেড়াবার ক্ষমতা হয়েছে, আর এটুকু বোঝবার ক্ষমতা হচ্ছে না যে, পাপ কখনো চাপা থাকে না। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে?'

ইন্দ্রনাথ নিষ্পলক দৃষ্টিতে পিসির মুখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো শোনে সমস্ত। তারপরই হঠাৎ পাখার রেগুলেটারটা শেষ প্রান্তে ঠেলে দিয়ে, বারান্দায় মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাকে—'জগ, জগ, শীগ্‌গির খানিকটা বরফ নিয়ে আয় তো!'

বরফ!

নীহারকণা ছিটফিটিয়ে ওঠেন—'ঢের সহ্য করেছি ইন্দু, আর না! খোলশ ভেঙে স্বমূর্তি বেরিয়ে পড়েছে তোমার। এখন আমাকে মাথায় বরফ চাপিয়ে পাগল সাজিয়ে রঁাচী পাঠিয়ে দিলেই কি পার পাবে? …রাগে দুঃখে ঘেন্নায় লজ্জায় চন্দর তোমাকে ত্যেজ্যপুত্তুর করেছে।'

'চমৎকার! বাবাও এর মধ্যে আছেন?'

ইন্দ্রনাথ একটু ব্যঙ্গহাসি হেসে বলে, 'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমরা যেন আদিকালের জমিদারতন্ত্রের মধ্যে বাস করছি। ত্যেজ্যপুত্তুর! বাঃ! বাঃ! তা' শূলে চড়ানো বা কেটে রক্তদর্শনের হুকুমটাই বা হয়নি কেন?'

'এখনো বাক্‌চাতুরী করে দোষ ঢাকতে চাস তুই?'

নীহারকণা যেন ক্রমশ আগুন হারিয়ে ছাই হয়ে যাচ্ছেন।

'এখনো স্বীকার পাবি না তুই?' মুখের চেহারা নিভন্ত অঙ্গারের মত হয়ে আসে।

'পিসিমা, বোস!'

ইন্দ্রনাথও কী ভেবে সহসা শান্তভাব ধারণ করে। ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'হঠাৎ ক্ষেপে গেলে কিসে, শুনতে দাও আমাকে। তড়বড় করে এমন কতকগুলো কথা বললে, যার বিন্দুবিসর্গ অর্থও আমার মাথায় ঢুকলো না।…কী হয়েছে কী? কে তোমাকে কী বলে ক্ষেপিয়ে গেছে?'

নীহারকণা স্তিমিত ভাবেই বলেন, 'হঠাৎ ক্ষেপবার মেয়ে আমি নই ইন্দু! তুই আজ আমাকে নতুন দেখছিস না। উপযুক্ত প্রমাণ

দেখিয়েছে, তবেই বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছি।'

'কিন্তু, বিশ্বাসটা কী নিয়ে?'

'সে কথা তো বলতে বাকি রাখিনি ইন্দু!—তুই ধর্মের নামে শপথ করে বল, তিন বছর আগে 'অরুণা' বলে কোথাকার কোন কলোনির একটা মেয়েকে বিয়ে করিসনি?···বল তোর মরা মায়ের ছবি ছুঁয়ে, সে মেয়ের গর্ভে তোর সন্তান হয়নি?···বল, বছরখানেক তুই তাদের মাসোহারা দিয়ে, এখন মাসোহারা বন্ধ করিসনি?'

মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ইন্দ্রনাথ।

তারপর নিতান্ত শান্ত, নিতান্ত স্থির স্বরে বলে, 'আমার মরা মা-র ছবি ছুঁয়ে কোন শপথ আমি করবো না পিসিমা!···না, নিজেকে বাঁচাবার জন্যেও না। বুঝতে পারছি কোথাও কিছু একটা ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার হয়েছে, আমার সুনাম নষ্ট করে হয়তো কারো কোন স্বার্থসিদ্ধি হবে। কিন্তু সে চুলোয় যাক! তুমি এবং বাবা সেকথা বিশ্বাস করেছ, এইটাই হচ্ছে আমার জীবনের পরম সত্য!'

'আমার মরা মায়ের ছবি ছুঁয়ে শপথ করতে বলছিলে পিসিমা? কী এসে যেত তাতে?···আমার জীবনে ওই ছবির মা তো চিরদিনই মৃত! আমার নিজের মা বেঁচে থাকলে কখনোই আমায় এই অসম্মান করতে পারতেন না। পারতেন না কোন একটা ইতরলোকের কথাকে বিশ্বাস করে আমাকে অবিশ্বাস করতে।···আচ্ছা, ঠিক আছে!'

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘরের বাইরে পা বাড়ায় ইন্দ্রনাথ।

মুহূর্তে যেন কী এক পরম মুক্তির আনন্দ অনুভব করে সে। বুঝি ঠিক মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তেই এ রকম মুক্তির স্বাদ পায় মানুষ। ভালই হল! ভালই হল! খসে পড়ল মিথ্যা ভালবাসার জীর্ণ খোলশ! খসে পড়ল দাবিহীন আশ্রয়ের আশ্রয়।

কিন্তু নীহারকণা চমকে ওঠেন।

এ কী ! চলে যায় যে !

এ যুগের সর্বনেশে ছেলে এরা, সব পারে ! এখুনি পারে চিরকালের মত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে চিরদিনের মত চলে যেতে !

'ইন্দু !'

ছুটে এসে পিছন থেকে ইন্দ্রনাথের পাঞ্জাবির কোণটা চেপে ধরেন নীহারকণা।

'সর্বনাশা ছেলে, মুখের খাবার ফেলে যাচ্ছিস কোথায় ?'

ফিরে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রনাথ একটু হাসে।

'যাচ্ছি, যেখানে মুখের কাছে খাবার এসে জোটে না !'

'আমাদের ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিস তুই ?'

'ত্যাগ !···আমি !'

আর একটু হাসে ইন্দ্রনাথ।

'সে তো অনেক আগে তোমরাই আমাকে করেছ।'

নীহারকণা কেমন একটা হতাশ অসহায় মুখে বলেন, 'তোর মা-র কথা তুলে তুই আমাকে খোঁটা দিয়েছিস ইন্দু, আমার কথা আর আমি বলবো না, কিন্তু তোর বাবার সঙ্গে দেখা না করে যেতে পারবি তুই ?'

বাবা তো রীতিমত অনশনব্রত করে আমাকে ত্যেজ্যপুত্র করেছেন পিসিমা, আমি তো মুক্ত।

'কিন্তু—কিন্তু সব অপবাদই যদি মিথ্যে সে কথা তুই পষ্ট করে বোঝাবি না ?'

'না !'

চিরদিনের তুর্জয় অভিমানিনী নীহারকণা অনেকক্ষণ যুঝেছেন, আর পারবেন কি করে ? তাই মুঠোয়-ধরে-থাকা জামার খুঁটটা ছেড়ে দিয়ে গম্ভীর ভাবে বলেন, 'গঙ্গায় যতক্ষণ জল আছে ইন্দু, আমাকে কেউ কিছুতেই ভয় পাওয়াতে পারবে না, ভাবনা শুধু চন্দরের জন্যে।—যাক, তার ভাবনা ভগবান ভাববেন। তবে একটা কথা তোকে শুনে যেতেই

হবে। ঈশ্বর জানেন, কার দোষ কার ভুল, তবু রক্তমাংসের মানুষ আমরা, ঈশ্বরের চোখ দিয়ে তো দেখতে পাই না, এই রক্তমাংসের চোখ দিয়েই দেখি। 'অরুণা' বলে যে মেয়েটা এসেছিল তার ছেলে নিয়ে মাকে সঙ্গে করে, দেখেছি তার চোখের জল, দেখেছি তার ছেলের মুখ-চোখ-রং-গড়ন, দেখেছি তার কাছে ফ্রেমে বাঁধানো ফটো। তোর আর তার দুজনের পাশাপাশি ফটো। সবই যদি আমার চোখের ভ্রম, সবই যদি আমার বোঝবার ভুল, বল—ছবি সে পেল কোথায়?'

পাশাপাশি ফটো…!

কবে কোথায় কার সঙ্গে পাশাপাশি ফটো তুলল ইন্দ্র!

বিমূঢ়ভাবে ইন্দ্র বলে, 'কী বললে? পাশাপাশি ফটো?'

'হ্যাঁ।'

নীহারকণা এবার আত্মস্থতায় ফিরে আসেন।—'ওই ফটো দেখেই আমার জোঁকের মুখে নুন পড়লো। নইলে আমিই কি আগে তাদের পুলিসে ধরিয়ে দিতে চাইনি?…ফটো তো আর মিছে কথা বলে না?'

'ফটোও মিছে কথা বলে পিসিমা। এই বিজ্ঞানের যুগে গাছ, মাটি, নদী, পাহাড় সকলকে দিয়েই মিছে কথা বলানো যায়। সত্যি-মিথ্যের বিচার নিজের বিবেকের কাছে। আমায় যদি কেউ এমন ফটো দেখাতো যে তুমি কারুর বুকে ছুরি বসাচ্ছো, আমি সে ছবিকে বিশ্বাস করতাম কি? তবে বুদ্ধির কাজ করতে, যদি সে ফটোটা আমাকে দেখাতে পারতে।—দেখতাম কার এই ষড়যন্ত্র! কিন্তু না, সে বুদ্ধি তোমাদের নেই, সে ধৈর্যও নেই। আমায় অবিশ্বাস করাটা সহজ, সেটাই করেছ।'

'ওরে নেমকহারাম ছেলে, সে চেষ্টা কি আমি করিনি? দিশেহারা হয়ে নিজের গলা থেকে ইষ্টদেবতার কবচসুদ্ধু হারছড়াটা খুলে দিতে গেলাম ওই ফটোর বদলে। দিল না। চোখের জলে ভাসতে লাগলো

ছুঁড়ি, মা বললো আর তো কোন সম্বল নেই ওর, ওইটুকু সম্বল। কোন্ প্রাণে বলবো ওটুকু হাতছাড়া করতে?'

'দেখ পিসিমা, সব যেন ধোঁয়ার মত লাগছে, মনে হচ্ছে কোন ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ছি। আচ্ছা যাক, এ রহস্য কোন একদিন ভেদ হবেই।—চললাম।'

হেঁট হয়ে নীহারকণাকে প্রণাম করে ইন্দ্রনাথ।

'চললাম! আবার চললাম কি?'—নীহারকণা চেঁচিয়ে ওঠেন, 'চললাম মানে কি?'

'মানে বুঝতে কষ্ট হচ্ছে বুঝি? তা হতে পারে। মা-মরা ছেলেকে মানুষ-টানুষ করলে এতদিন ধরে। কিন্তু পিসিমা, বুঝলাম 'মানুষ' করেছে এ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে কিছুই করনি। শুধু পালনই করেছ। ভেবেছ শুধু খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখছি, আবার কি! যাক্, সে ঋণ তো শোধ হবার নয়, রইলই সে ঋণের বোঝা।'

নিচে চাকর-বাকররা চমকে উঠল নীহারকণার গগনভেদী চিৎকারে।

'ওরে, ওরে সর্বনেশে ছেলে, সত্যি চলে যাচ্ছিস মুখের খাবার ফেলে?···চন্দর, অ'চন্দর, কী কাল ঘুম ঘুমোচ্ছিস তুই হতভাগা! ওরে কী করতে কী হলো,···ইন্দু যে আত্মঘাতী হতে গেল। ওমা, কি কালনাগিনীরা এসেছিল রে! ওরে আমি কেন আত্মঘাতী হচ্ছি না?'

কথাগুলো কোনখান থেকেই স্পষ্ট শোনা যায় না, শুধু বামুন-চাকর দারোয়ান তিনটে লোক হাতের তাস ফেলে দোতলায় উঠবার সিঁড়ির দিকে দৌড়তে থাকে, ওদিকে তিনতলায় চন্দ্রনাথ সদ্য-ঘুম-ভাঙা বিপর্যস্ত দেহে দৌড়তে থাকেন দোতলায় নামবার সিঁড়ির দিকে।

ইন্দ্রনাথ চাকর-বাকরগুলোর পাশ কাটিয়ে তরতর করে নেমে যায়,—'এই শীগ্‌গির উপরে যা, পিসিমার মাথা গরম হয়ে গেছে।

আমি ডাক্তার আর বরফ আনতে যাচ্ছি।'

অবস্থাটা খুবই স্বাভাবিক। তাড়াতাড়ি ডাক্তারের দরকার হলে অমনি করেই নেমে যায়।

কে ভাবতে পারবে বাড়ির প্রাণের প্রাণ, সোনার কৌটোয় রাখা সাতশো রাক্ষসের একপ্রাণ দাদাবাবু অভিমান করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল চিরদিনের মত!

তারা স্ফুর্তিসেই ছুটল।

পিসিমা মাথা গরম করে চেঁচাচ্ছে, এ যে একটা মজাদার খবর।

চন্দ্রনাথের ক্ষমতা নেই খুব বেশী উত্তেজিত হবার।

পঁচিশ বছর বয়সে বিপত্নীক, তারপর কেটে গেল আরো আঠাশটা বছর। নিজের সংসারে, প্রভূত উপার্জন করেও কেমন একটা দাবিহীন মনোভাব নিয়েই কেটে গেল জীবন। কেবল যে দিদি নীহারকণার প্রতিই তিনি কৃতজ্ঞ তা নয়, দাসদাসীর প্রতিও যেন নিতান্ত কৃতজ্ঞ চন্দ্রনাথ। তাঁর এতটুকু কাজ কেউ করে দিলে কৃতার্থম্মন্যের মত 'থাক্ থাক—এত কেন' করে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

আর ছেলে?

শৈশবকাল থেকে নিজের ছেলেকে রাজপুত্রের সম্মান দিয়ে আসছেন চন্দ্রনাথ। ছেলে যদি একবার স্বেচ্ছায় তাঁর কাছে এসে বসতো, চন্দ্রনাথ বর্তে যেতেন। সেই থেকে এই অবধি একই ভাব। ইন্দ্রনাথ যা কিছু করেছে—কখনো বাধা দেননি। নীহারকণার ভাষায় যা 'ভূতের ব্যাগার,' সেই সমাজকল্যাণ সঙ্ঘের ব্যাপারেও অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে এসেছিলেন ছেলেকে।

ছেলের বিয়ে?

সে সম্বন্ধেও স্পষ্ট কোন চেতনা ছিল না চন্দ্রনাথের। নিশ্চিন্ত আছেন, দিদি যা ভাল বুঝবেন করবেন।

কিন্তু নীহারকণা?

নীহারকণার পক্ষে ইন্দুর বিয়ে বিয়ে করে যতটা ব্যস্ত হওয়া উচিত তা কি নীহারকণা হয়েছেন কোনদিন? হয়তো হননি। পরমাসুন্দরীর খোঁজে বৃথা গড়িয়ে দিচ্ছেন দিন মাস বছর।

কে বলতে পারে এ মনোবৃত্তির পিছনে কী আছে!

হয়তো তাঁর চিরবঞ্চিত জীবনে, কেবলমাত্র দৈবানুগ্রহে যে দুর্লভ রত্নটির মালিকানা পেয়েছিলেন, সেটি চট করে হাতছাড়া করে ফেলতে·

মন সায় দিচ্ছে না।

কিন্তু একথা নীহারকণা নিজেই বোঝেন না, তা চন্দ্রনাথ!

চন্দ্রনাথ এত কথা বোঝেন না।

চন্দ্রনাথ নিশ্চিন্ত চিত্তে দিনের পর রাত্রি আর রাত্রির পর দিনের চক্রে পাক খেতে খেতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্বে—প্রৌঢ়ত্ব থেকে বার্ধক্যের পথে। মনের পরম আশ্রয় 'দিদি আছেন।' পিঠোপিঠি ভাইবোন, এক বছরের বড় দিদি, তবু চন্দ্রনাথের কাছে দিদি অনেক উঁচুতে।

হঠাৎ আজ নীহারকণা যখন অজস্র কান্নাকাটি, আস্ফালন শেষ করে চলে গেলেন, তখন স্তব্ধ হয়ে ভাবতে লাগলেন চন্দ্রনাথ,···তিনি কি কোনদিন ছেলের প্রতি উচিত কর্তব্য করেছিলেন?···তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়েছিলেন!

তবে কেন 'ইন্দ্রনাথ কিছুতেই একাজ করতে পারে না' বলে জোর করছিলেন। কেন ভাবতে পারছিলেন না সম্ভব হওয়াও অসম্ভব নয়।

চন্দ্রনাথ কি ইন্দ্রনাথকে চেনেন?

চেনবার চেষ্টা করেছেন কোনদিন?

ইন্দ্রনাথের জীবনের পরিধি কতদূর বিস্তৃত সে খবর কি চন্দ্রনাথ রাখেন? একদা মাতৃহীন শিশুকে দিদির কাছে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন, আজও রয়ে গেছে সে নিশ্চিন্ততা। সেই দুরন্ত শিশুটা ক্রমশ মাপে বড় হয়ে উঠেছে, উঠেছে বিদ্বান হয়ে, চোখজুড়ানো রূপ নিয়ে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে, এই দেখে দেখেই চন্দ্রনাথের বুক ভরে গেছে। সেই ভরা বুক আর ভরা মনের নিশ্চিন্ততা নিয়ে একভাবে কাটিয়ে যাচ্ছিলেন, কোনদিন কি খেয়াল করেছেন শুধু মাপে বড় হওয়াই শেষ কথা নয়, তার মাঝখানে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে পুরো পরিণত একটা মানুষ!

যে যুবক হয়ে উঠেছে, সে যদি যৌবনের ধর্ম পালন করে থাকে,

তবে এত ভয়ংকর রকম অবাক হবার কী আছে ? প্রকৃতিই তো তার মধ্যে বিকশিত করে তুলেছে প্রেম, কামনা, সৃষ্টির বাসনা। আমার সন্তান একদা শিশু ছিল বলে চিরদিনই সে শিশু থাকবে এইটাই কি বুদ্ধিমানের যুক্তি ? প্রকৃতি তার মধ্যে বসে আপন কাজ করে চলবে না ?

এখন এত কথা ভাবছেন চন্দ্রনাথ, কিন্তু তখন ভাবতে পারেননি, যখন নীহারকণা এসে আছড়ে পড়েছিলেন। বলেছিলেন, 'চন্দর, মানুষ চিনি বলে বড় অহঙ্কার ছিল, সে অহঙ্কার চূর্ণ করে দিয়েছে ভগবান। ইন্দু আমাদের মুখে চুনকালি দিয়েছে।'

ইন্দু চুনকালি দিয়েছে !

দিশেহারা চন্দ্রনাথ তখন হতভম্ব হয়ে বলে উঠেছিলেন, 'কী বলছো দিদি, আমি তো কিছু বুঝতে পারছিনা।'

'বুঝতে পারবিনে চন্দর, বোঝবার কথা নয়। তবু ভগবান কাঁটার চাবুক মেরে বুঝিয়ে ছাড়লেন। ইন্দু আমাদের লুকিয়ে বিয়ে করেছে ছেলের বাপ হয়েছে।'

'কী পাগলামি করছো দিদি ?' বলেছিলেন চন্দ্রনাথ, চিৎকার করে নয়, তীব্র প্রতিবাদে নয়। নীহারকণার মাথায় হঠাৎ কিছু ঘটেছে ভেবে হতাশা বিস্ময়ে বলেছিলেন, 'হঠাৎ কি দুঃস্বপ্ন দেখলে ?'

'তা'নয়, তা'নয় চন্দর, এতদিন তুই আমি দু'দুটো আস্তমানুষ চোখ মুদে পড়ে পড়ে অলীক সুখস্বপ্ন দেখছিলাম, জ্ঞান ছিল না চোখ খুললে পৃথিবীটাকে দেখতে হবে। নোংরা কুচ্ছিৎ নিষ্ঠুর পৃথিবী !'

'কিন্তু হয়েছেটা কী ?'

কী হয়েছে সব খুলে বলেছিলেন নীহারকণা।

মাঝ খানে মাঝ খানে খানিক কেঁদে, খানিক মাথা খুঁড়ে। বুত

বলেছিলেন !—বিকেল থেকে যা যা ঘটেছে, আর সেই কালশত্রু ছুটোর সঙ্গে যা যা কথা হয়েছে সমস্তই খুলে বলেছিলেন নীহারকণা। আর সেই শুনে চন্দ্রনাথ বলে উঠেছিলেন, 'অসম্ভব ! এ হতেই পারে না। ইন্দুর দ্বারা কখনো এ কাজ হতে পারে না।'

জোর গলায় বলেছিলেন।

যতক্ষণ না জোঁকের মুখে নুন পড়েছিল, ততক্ষণই মাথা নেড়ে নেড়ে বলেছিলেন, 'এ হতে পারে না দিদি, এ হতে পারে না! এ কোন ষড়যন্ত্রের ব্যাপার।'

এখন ভাবছেন চন্দ্রনাথ, কেন বলেছিলাম এ কথা, কেন এত দৃঢ় বিশ্বাস রেখেছিলাম ছেলের উপর ?—ভাবলেন, আমি কি কোনদিন যাচাই করে দেখেছি তার দ্বারা কী হতে পারে, আর কী হতে পারে না ?

বারবার ভাবলেন চন্দ্রনাথ,—তিনি কি কোনদিন কৌতূহলবশেও একবার উঁকি মেরে দেখতে গিয়েছেন, ইন্দ্রনাথের সমিতিটা কী, কী কাজ সেখানে হয় ?

কত সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলেরাও তো কত রকমের গুপ্ত সমিতি করে, দেশের কল্যাণের নাম করে অকল্যাণের আগুন জ্বালিয়ে বেড়ায়, শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মার্জিতরুচি যুবকের দল দেশকে নিয়ে কতই না ছিনিমিনি খেলে বেড়ায়, ইন্দ্রনাথও যে তেমন কোন দলে গিয়ে পড়েনি কে বলতে পারে ? আর হয়তো সেই সূত্রে কখন কোন ফ্যাসাদের মধ্যে মাথা গলাতে গিয়ে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে। বাড়িতে জানাতে পারেনি ভয়ে আর লজ্জায় !

বারবারই ভাবতে চেষ্টা করলেন, 'অসম্ভব নয়, অসম্ভব নয়' তবু বারবারই মন ক্লিষ্ট পীড়িত সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে এই নিষ্ঠুর সত্যটা স্মরণ করে—তাঁর ছেলে এই হলো !

না, এত যন্ত্রণা চন্দ্রনাথের ইন্দ্রনাথ কোন দুর্বলতার বশে বিয়ে করে

বসেছে বলে নয়, লজ্জায় ভয়ে সে সংবাদ গোপন করেছে বলেও নয়, যন্ত্রণা—ইন্দ্রনাথ তার সেই স্ত্রীপুত্রকে ত্যাগ করেছে, করেছে তাদের অন্নমুষ্টি বন্ধ করে দেওয়ার মত নীচতা।

কী লজ্জা!

কী লজ্জা!

আবার এই লজ্জার গ্লানির মধ্যেও চোখের সামনে ভেসে উঠছে ছেলের সেই সুকুমার কান্তি দেবোপম মূর্তিখানি। তখন আর হিসেব মেলাতে পারছেন না চন্দ্রনাথ। রাগ আসে না, রাগ করতে জানেন না চন্দ্রনাথ, রাগ করতে শেখেননি কখনো, তাই বারবার মেয়েদের মত চোখের জল মুছেছেন বসে বসে। জলবিন্দুটি পর্যন্ত মুখে দেননি!

তারপর?

অনেক রাতে স্তব্ধতার বুক চিরে নীহারকণার চিৎকার উঠল।

উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে নেমে এলেন।

আর যখন নীহারকণা পাগলের মত কেঁদে উঠলেন, 'ওরে চন্দর ছুটে বেরিয়ে দেখ লক্ষ্মীছাড়া ছেলে কোন্‌দিকে গেল। ও চন্দর, কেন মরতে আমি তাকে বলতে গেলাম,—তোর বাপ মনের ঘেন্নায় তোকে তেজ্যপুত্তুর করেছে—সেই অভিমানে তক্ক করলো না, প্রতিবাদ করলো না, জন্মেরশোধ 'চললাম' বলে চলে গেল। যা চন্দর ছুটে যা, ঝোঁকের মাথায় যদি কী না কী সর্বনাশ করে বসে কী করবো, আমি কী করবো!' তখন সমস্ত কলরোল, সমস্ত বিপদাশঙ্কা ছাপিয়ে অভূতপূর্ব একটা শান্তিতে বুকটা ভরে ওঠে চন্দ্রনাথের। মনের গভীরে অন্তরালে কে যেন প্রার্থনা করতে থাকে—'তাই হোক, তাও ভাল। ভয়ানক একটা কিছুই করে বসুক ইন্দ্রনাথ!

মুখ থাকুক চন্দ্রনাথের, নীহারকণার কাছে।

মুখ থাকুক ইন্দ্রনাথের জগতের কাছে, থাকুক সভ্যতা আর সম্ভ্রমের কাছে।

পরাজিত হোন্ নীহারকণা!

এ এক আশ্চর্য হৃদয়-রহস্য।

চিরদিন যে মানুষটাকে ভয় ভক্তি আর সম্মানের উচ্চাসনে বসিয়ে রেখে এসেছেন চন্দ্রনাথ, আজ একান্ত কামনা করছেন তাঁর পরাজয় ঘটুক। যদি সে কামনা পূরণের জন্যে চরম মূল্য দিতে হয়, তাও হোক। চন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেননি পুত্রের গ্লানি, নীহারকণা করেছিলেন।

এখন? বেশ হয়েছে! বেশ হয়েছে! আঃ ইন্দ্র!

নিরীহ গোবেচারা চন্দ্রনাথের হঠাৎ এ যেন এক অদ্ভুত নিষ্ঠুর মনোবৈকল্য!

আর একবার আছড়ে পড়লেন নীহারকণা, 'তবু সঙের মতন দাঁড়িয়ে রইলি চন্দর? আমিই কি তবে এই রাতদুপুরে রাস্তায় বেরোবো?'

চন্দ্রনাথ চেতনা ফিরে পেলেন। রাস্তায় বেরোলেন।

ননীমাধব এসে দাঁড়ালো হাসতে হাসতে।

'কী মাসি কী খবর? হলো কিছু?'

কেষ্টমোহিনী মুখের হাসি গোপন করে, মুখে কিছুটা উদাস ভাব এনে বলে, এখন তো নগদ বিদেয়! তারপর দেখা যাক। কে জানতো ও রকম দজ্জাল একটা পিসি আছে ঘরে।

হৃদয়-উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করতে রাজী নয় কেষ্টমোহিনী। বেশি ব্যক্ত করলেই তো ননীকে বেশি বেশি ভাগ দিতে হবে। তবে ভেতরে ভেতরে আহ্লাদ উথলে উঠছিল। এখন তো নগদ বিদায় একশো টাকা। আর ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি? বৌ নাতিকে ঘরে তুলতে পারুন না পারুন, মাসে মাসে একশো টাকা করে মাসোহারা দেবেন নীহারকণা। এ প্রতিশ্রুতি পেয়েছে কেষ্টমোহিনী।

ঘরে তুলতে দিচ্ছে কে!

খুব হেসেছিল তখন কেষ্টমোহিনী, তুই মাগী বৌ নাতি ঘরে তুললে কেষ্টমোহিনী মা লক্ষ্মীকে ঘরে তুলবে কোন্ পথ দিয়ে? ওই ফরসা টুকটুকে ছেলেটাই হল কেষ্টমোহিনীর লক্ষ্মীর সরা। ভাগ্যিস যাই নয়না ছুঁড়ি ছেলেটাকে ভাড়া খাটায়। এই এতটুকুন থেকে কত জায়গায় গিয়ে কত রোজগার করল ছোঁড়া।

পেয়ারাবাগানের সেই দাসেদের বাড়ি?

ওঃ, তাদের কত্তাগিন্নীতে তো লাঠালাঠিই বেঁধে গেল। তবু তো বুড়ো কত্তা! অবিশ্যি ভীষ্মদেব তিনি নন,—মদো মাতাল, আরও অনেক গুণের গুণনিধি। কেষ্টমোহিনী নিজেই তাঁর গুণের সাক্ষী। সেই ভরসাতেই বুকের পাটা শক্ত করে কমলিকে নিয়ে আর নয়নার ওই ছেলেটাকে নিয়ে গিয়ে দাসগিন্নীর কাছে কেঁদে পড়ে পাঁচশোখানি টাকা আদায় করে এসেছে কেষ্টমোহিনী।

অবিশ্যি শুধু কান্নায় হয়নি, ভয় দেখাতে হয়েছে। লোক-জানাজানি করে দেবার ভয়। দাসগিন্নী সহজেই বিশ্বাস করেছিল, কর্তার রীতি-চরিত্তির তো বরাবরই জানতো! চুপি চুপি বলেছিল কেষ্ট-মোহিনীর কাছে, ওই বুড়ো বদমাশের হাতে দড়ি পড়লেই আমি বাঁচতাম বাছা, উচিত শাস্তি হতো। তোমার মামলার খরচা আমিই জোগাতাম।—নাতনীর বয়সী একটা পুঁটকে ছুঁড়ির সঙ্গে কেলেঙ্কার করার মজাটা টের পেত! কিন্তু কী করবো বাছা, এই সম্প্রতি ছেলের বিয়ে হয়েছে, মস্তবড় বনেদী ঘরে। বৌ এখেনে রয়েছে, সে টের পেলে আমাকেই গলায় দড়ি দিতে হবে। সেই ভয়েই তোমাকে এই ঘুস দিচ্ছি। কিন্তু মা কালীর দিব্যি যেন আর কেউ জানতে না পারে।

কেষ্টমোহিনী অবিশ্যি তাতেও জের মারেনি। বলেছে,—কিন্তু মা, আমি গরিব মানুষ, দু-দুটো মানুষ পুষি কোথা থেকে? নিতান্ত নিরুপায় বলেই না ওই পঞ্চাশ ষাট বছরের বুড়োর সঙ্গে বোনঝির বে' দিই! কে জানে মা তোমার মতন এমন জগদ্ধাত্রী ঘরে? আমায় বলেছিলেন দশ বারো বছর হলো পরিবার গত হয়েছে, বেটার বৌরা সেবা যত্ন করে না—

কথা শেষ করতে হয়নি কেষ্টমোহিনীকে। ধেই ধেই করে নেচে উঠেছিল দাসগিন্নী।...কী বললে?...পরিবার 'গত' হয়েছে? আসুক সে আজ। বুঝিয়ে দেব কেমন গত হয়েছে। তারপর—'আবার দেব কিছু' বলে প্রতিশ্রুতি।

আর সেই হোমিওপাথি ডাক্তারটা! কেলে জোঁক।

তার জন্যে অবশ্য আর একটা ছেলে ভাড়া করতে হয়েছিল। এমন চাঁদের টুকরোর মত ছেলে সেই কেলে চামচিকের, তা বিশ্বাস করানো যেত না।

তা সেবারে অসুবিধেতেও কম পড়তে হয়নি।

লোকটার সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি !

তা কেষ্টমোহিনী কি আর হার মানবে ? বলে কত বছর মিনার্ভা থিয়েটারে প্লে করে এল। দজ্জাল ঝি চাকরানীর পার্ট করতে হলেই কেষ্টাকে ডাক পড়তো। মুখের চোটে পাড়ার লোক জড়ো করে ডাক্তারকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিল কেষ্টমোহিনী। মজা এই, ডাক্তারের কথাই অবিশ্বাস করলো সবাই ! অবিশ্বাস করার হেতুও ছিল। চিকিৎসা করতে এই পাড়াতেই চব্বিশ ঘণ্টা গতিবিধি ডাক্তারের।

তাছাড়া কমলিও তো কম অভিনয় শেখেনি। কেষ্টমোহিনীকেই তাক্ লাগিয়ে দেয় মাঝে মাঝে। তার মাঝে মাঝে মাথা হেঁট করে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা, মাঝে মাঝে মাসিকে থামানোর জন্যে ব্যাকুলতা, আর মাঝে মাঝে কোলের ছেলেটাকে জাপটে ধরে কান্না, দেখলে সাধ্য কি কেউ তাকে অবিশ্বাস করে !

কখনো বলতে হয় বিয়ে করে পালিয়েছে, কখনো বলতে হয় নষ্ট করেছে। সহায় ওই ননীমাধব। কত কায়দাই করে।

আর কত রকম সাজতে হল কেষ্টমোহিনীকেই !

কখনো মা, কখনো মাসি, কখনো দিদিমা। কী করবে ? বেয়াড়া মেয়েটা যে রোজগারের সোজা পথটায় কিছুতেই পা দেবে না। মিথ্যে অপবাদের ডালি মাথায় বইবে, মিথ্যে কলঙ্কের কালি মুখে মাখবে, তবু—

ননী বললো, 'বলি মাসি, কিছু ছাড়ো-টাড়ো ! একেবারে গুম্ হয়ে গেলে যে ! পাওনি কিছু ?'

'পাইনি' বলতে পারলেই কেষ্টমোহিনী বাঁচতো। কিন্তু কমলি লক্ষ্মীছাড়ীর কাছে কি পার পাওয়া যাবে তা'হলে ? বাছার যে ননীদা'র ওপর সাতখানা প্রাণ। ওর কাছে একেবারে সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের ধর্মকন্যে হয়ে বসবেন।

তাই বাধ্য হয়ে বলতে হয় কেষ্টমোহিনীকে, 'না পেয়ে কি আর ছেড়ে এসেছি ?'

'কত ? কত ?'

আশায় আনন্দে দুচোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে ননীর।

'দিয়েছে—শ' খানেক।'

'শ' খানেক !'

ননী গম্ভীরভাবে বলে, 'মন্দ কি। তাছাড়া এক মাঘে তো শীত পালায় না। দাসকত্তা যে গিন্নীর ভয়ে এখনো মাসোহারা দিচ্ছে। বুড়ো ঘুঘু দুর্নামের ভয়ে পুলিস ডাকতে পারে না। জানে তো, ডাকতে গেলে তাকেই পাবলিক মেরে লাট্ করে দেবে একেবারে।'

হি হি করে হাসতে থাকে ননীমাধব।

'টাকা এখুনি নিয়ে কী করবি তুই ?'

'শোন কথা ! টাকা নিয়ে কী করবি ! নতুন একখানা ভাষা শোনালে বটে মাসি !···ফটোর খরচা নেই আমার ? ফিলিমের আজকাল কত দাম জানো ? পাওয়াই যায় না। কত কায়দা-কৌশল করে কাটামুণ্ডু ধড়ে জুড়তে হয়, তবে না ? তোমার ব্যবসার মূলধন তো ওই ফটো ! ওই থেকে কত টাকা তুলছ। অথচ ননীকে পাঁচটা টাকা দিতে হলেই তোমার হাত কাঁপে।'

কেষ্টমোহিনী মুখ ঝামটা দিয়ে বলে ওঠে, 'আমার জন্যেই শুধু করছিস কিনা ! কিসের আশায় খেটে মরছিস, সে আর জানতে বাকি নেই আমার। বলি, আমার মজুরিটা বুঝি কিছুই না ?···কত ঝুঁকি নিয়ে একাজ করতে হয় জানিস কিছু ? সেবার সেই ভোটের বাবুটার বাড়িতে ?—মার খেতে বাকি ছিল শুধু। আমাদের আটকে রেখে পুলিস ডাকতে যায় আর কি ! নেহাৎ কমলির বুদ্ধির জোরেই প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছিলাম সেদিন। ও যখন কায়দা করে ঘাড়

তুলে বললে,—'পুলিস ডেকে জেলে দেবেন এ আর বিচিত্র কথা কি! আইন-আদালত সবই তো বড়লোকের জন্যে। গরিব চিরদিনই চোর, মিথ্যেবাদী, অপরাধী।'—তখন কত্তার জোয়ান ছেলেটা কেমন ঘাবড়ে গিয়ে বাপের দিকে কটমটিয়ে তাকালো। তারপর দারোয়ানকে বললো 'গেট খুলে দে।'···পথে এসে এক ঘণ্টা ধরে হাত-পা কেঁপে বুক ধড়ফড়িয়ে মরি।'

ননী হো হো করে হেসে ওঠে, 'হাসালে মাসি, তোমরও হাত-পা কাঁপে, বুক ধড়ফড় করে?'

'না, আমার বুক পাথর দিয়ে তৈরি।' বলে কেষ্টমোহিনী অপ্রসন্ন মুখে ঘরে ঢুকে যায় টাকা আনতে।

ননী সব বিষয়ে সাহায্য করে সত্যি, কিন্তু এই এক মস্ত দোষ ননীর, ফি হাত ভাগ চায়। আরে বাবা, তোকেই যদি অর্ধেক দিয়ে দেবো তো হু'হুটো মানুষের চলে কিসে?

তাই কি থিয়েটারে ঢোকাতেই রাজী করানো গেল লক্ষ্মীছাড়া নির্বুদ্ধি মেয়েটাকে?

কিছু করবেন না উনি!

ভদ্দর থাকবেন!

তবু ননী যাই এই এক বুদ্ধি আবিষ্কার করেছে, অপমানের ভয় দেখিয়ে মোচড় দিয়ে আদায়, তাই যাহোক করে চলছে। কিন্তু ওই দোষ ননীর, খালি টাকা! টাকা!

'মোটে পনেরো?' ননী বেজার মুখে বলে।

কেষ্টমোহিনী আরও বেজার মুখে বলে, 'তবে সব টাকাই নিয়ে যা। আমরা হরিমটর করি!'

অপ্রতিভ হয় ননী।

টাকাটা পকেটে পুরে উদাসভাবে বলে, 'হতচ্ছাড়া ননীরও যে

হরিমটরের অবস্থা মাসি। নইলে কি তোমাদের উপায়ে ভাগ বসাতে আসি। এক এক সময় মনে হয়, দূর ছাই, এসব ছেড়ে ছুড়ে ভেগে পড়ি।'

'সে আমারও করে।'

বলে উঠে যায় কেষ্টমোহিনী।

ননী কিন্তু টাকা নিয়েই চলে যায় না। এদিক-ওদিক তাকিয়ে টুক্ করে উঠোন পার হয়ে ওদিকের ছোট্ট ঘরটায় ঢুকে পড়ে।

সে ঘরে একখানা সরু চৌকির ওপর উপুড় হয়ে পড়ে কী একখানা ছবি দেখছিল কমলি ওরফে অরুণা, ওরফে আরও অনেক কিছু।

ননীর পায়ের শব্দে ঘাড় ফিরিয়েই চমকে উঠে তাড়াতাড়ি সেখানা উল্টে রেখে উঠে বসলো।

ননী চৌকির একপাশে বসে পড়ে সন্দেহের সুরে বলে, 'ছবিখানা তাড়াতাড়ি চাপলি যে?'

'ছবি! কোন্ ছবি? ওঃ! এইটা, ফটোটা!'

কমলা যেন হঠাৎ ভারি অপ্রস্তুত হয়ে যায়। তার পরই কী ভেবে হেসে উঠে বলে, 'চাপলাম পাছে তোমার অহঙ্কার বেড়ে যায়।'

'আমার অহঙ্কার!'

'হ্যাঁ গো মশাই! বিভোর হয়ে পড়ে পড়ে দেখছিলাম তোমার ফটোর কায়দা। সত্যি, অবাক হয়ে যাই ননীদা, কী করে কর! কোথায় আমি, আর কোথায় এই লোকটা! অথচ এমন বেমালুম মিলিয়ে দিয়েছ, যেন সত্যি ওর সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছবি তুলেছি।...এতে আবার আমাকে ফুলের মালা ফুলের মুকুট পরিয়ে সং সাজিয়েছ বলেই আরও হাসি পাচ্ছে।'

'সং!'

ননী হেসে উঠে বলে, 'কই, দেখি আর একবার সংটা কী রকম!'

ছোট সাইজের বাঁধানো ফটোখানা এগিয়ে ধরে কমলা। দিয়ে যেন

নিতান্ত নিস্পৃহভাবে তাকিয়ে থাকে ননীর দিকে

ননী নিষ্পলক নেত্রে কিছুক্ষণ ছবিটার দিকে তাকিয়ে থেকে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে,—'কতবারই এরকম কায়দা কৌশল করলাম, কিন্তু এই ছবিখানা করে ইস্তক বুকটা যেন ফাঁকা ফাঁকা হয়ে গেছে।'

'ওমা সে কী?'

কমলা একটু বেশি মাত্রাতেই হেসে ওঠে। 'ফাঁকা ফাঁকা কি গো? বরং বল যে বুকটা ভরাট হয়ে উঠেছে। এইটাই তো সব থেকে ভাল হয়েছে। দিন দিন তুমি বেশি বাহাদুর হয়ে উঠেছ ননীদা।'

'দূর ভাল লাগে না।'

ননী ছবিটা ঠেলে রেখে বলে, 'ওই লোকটার পাশে তোর ওই ক'নে-সাজা ছবিটা দেখলেই প্রাণটা মোচড় দিয়ে ওঠে।'

কমলা আরও প্রগল্‌ভ হাসি হাসতে থাকে। অনেকক্ষণ হেসে বলে, 'এক নম্বর বুকটা ফাঁকা ফাঁকা, দু'নম্বর প্রাণটা মোচড়। লক্ষণ তো ভাল নয় ননীদা? কী হল তোমার?'

ননী নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'নাঃ হবে আর কী? ছবিটা দেখছি আর মনে হচ্ছে ওর পাশেই ঠিক মানিয়েছে তোকে।'

কমলা ফের হি হি করে হাসে। হেসে হেসে মাথা দুলিয়ে বলে, 'ঠিক যেমন মানায় রাজপুত্রের পাশে ঘুঁটেওয়ালীকে।...সে যা দেখে এলাম ননীদা, মনে হল স্রেফ রাজপুত্রই! তুমি তো দোর থেকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে এলে। আমার এদিকে বাড়ি ঢুকতে পা কাঁপছে। এর আগে এতবড় বাড়িতে কখনো যাইনি বাপু। ভারি ভয় করছিল।'

ননী উদাসভাবে বলে, 'ভয় আমারই কি না করছিল। অথই জলের মুখে, জ্বলন্ত আগুনের মুখে ঠেলে দিই তোকে শুধু দুটো টাকার জন্যেই তো? এই যদি আজ আমার অবস্থা ভাল হতো—'

চুপ করে যায় ননী। বোধকরি গলাটা ধরে যায় বলেই।

কমলা এবার ম্লান হয়ে যায়। ম্লান মুখেই বলে, 'সত্যি ননীদা, তাই ভাবি কেন এমন হয়! এই ওদের বাড়ি গিয়েই মনে হচ্ছিল, ওদের যত টাকা তার একশো ভাগের একভাগও যদি তোমার থাকতো ননীদা!'

'একশো ভাগের?'

ননী ঝাঁজের সঙ্গে বলে ওঠে, 'তোর তা'হলে কোন ধারণাই নেই। লক্ষ লক্ষ ভাগের এক ভাগ বল বরং। আমাদের কি কোন ভাগই আছে ছাই! এই পৃথিবীতে কোন কিছু ভাগ নেই আমাদের, এই হচ্ছে ভগবানের বিচার, বুঝলি কমলি?'

কমলাও একই রকম ঝাঁজালো সুরে বলে, 'যা বলেছ ননীদা! অথচ এই ভগবানের কাছেই নাকি মানুষের পাপপুণ্যির বিচার! চুরি করলে পাপ, লোক ঠকালে পাপ, মিছে কথা বললে পাপ, নিজেকে নিজে খারাপ করলেও পাপ—কিন্তু ভগবানের পাপের বিচার করবার জন্যে কোথাও কেউ থাকলে যে কী দুর্দশা হতো লোকটার, তাই ভাবি।'

ননী গম্ভীরভাবে বলে, 'ভগবানের পাপের? গরম তেলে ফেলে ভাজলেও ভগবানের উচিত শাস্তি হয় না, বুঝলি? ভেবে দেখ দিকি, মানুষগুলোকে গড়লো, তাদের মধ্যে লোভ হিংসে রাগ অভিমান ঠেসে ঠেসে ভরে দিল, অথচ উপদেশ দিলো কী 'তোরা দেবতা হ'।...পাগল না মাতাল? তা'পর দেখ, মানুষ গড়েছিস গড়, তাদের পেট গড়বার কী দরকার ছিল তোর? এমন পেট গড়েছে, সে পেটে দিনরাত রাবণের চিতা জ্বলছে। একবেলা তাকে ভুলে থাকবার জো নেই! ছি ছি!'

ননী প্রায়ই এ ধরনের কথা বলে। আর এসময় ভারি উত্তেজিত দেখায়।

এরকম সময় কমলার ভারি মায়া লাগে ওকে দেখতে। তাই প্রায়ই অন্য প্রসঙ্গ তুলে ঠাণ্ডা করে।

আজও হঠাৎ মুচকি হেসে বলে, তাই কি শুধু পেটেরই জ্বালা ননীদা? পেটের ওপরতলায় যার বাস,—সেই মনের? সেখানেই কি জ্বালা কম? সেখানেও তো খিদে তেষ্টা! সেখানেও তো দিনরাত রাবণের চিতা!'

ননী অপলক নেত্রে একবার কমলার হাসি-ছিটকানো মুখটা দেখে, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সবেগে বলে, 'তোকে যে আবার ভগবান কা দিয়ে গড়েছে তাই ভাবি। এততেও হাসি আসে তোর?'

'আসবে না মানে? বল কি ননীদা? হাসির সালসাতেই তো জীইয়ে আছি এখনো। যেদিন হাসি থাকবে না, সেদিন কমলিও থাকবে না!...ও কি, চলে যাচ্ছ যে?'

'চলে যাব না তো কি থাকতে দিবি? তার বেলায় তো—'

খিঁচিয়ে ওঠে ননীমাধব।

কমলা চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে চুপচাপ।

অপ্রতিভ ননী মাথা হেঁট করে আবেগরুদ্ধ স্বরে বলে, 'আর পারছি না, বুঝলি কমলি! এক এক সময় মাথাটা খারাপ হয়ে যায়। নিত্যি নিত্যি মিথ্যে সিঁদুর পরেই মরছিস, সত্যি সিঁদুর আর দিতে পারলাম না তোকে।'

'দিন একদিন আসবেই ননীদা। ভগবানের রাজ্যে—'

'ফের ভগবান!' ধমকে ওঠে ননী।

কমলা হেসে ফেলে বলে, 'মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় ননীদা। চিরকালের অব্যেস তো? তবুও বলি, ভগবান যে একেবারে নেই তাই বা বলা যায় কী করে? এই ধর না কেন, তুমি যদি এই ফন্দিটি আবিষ্কার না করতে, আজ আমাদের কী দুর্দশা হতো বলতো? মাসি কি তা'হলে আমাকে ভাল থাকতে দিত? মেরে হাত-পা বেঁধেও—'

হঠাৎ কেঁদে ফেলে কমলি।

ননী বিমূঢ়ভাবে একটু তাকিয়ে বলে, 'কান্নাটান্না রাখ কমলি। কান্না আমি বরদাস্ত করতে পারিনে। শোন, উঠে পড়ে লেগে কাজের চেষ্টা আমি করছি। তোদের ভগবান যদি নেহাৎ শয়তান না হয়, একটাও কি লেগে যাবে না? তারপর—'

ননীর চোখদুটো আবেগে কোমল হয়ে আসে।

খাটো ধুতি আর হাফশার্ট-পরা নিতান্ত গ্রাম্য-চেহারার ননীর শ্যামলা মুখেও যেন একটা দিব্য আলো ফুটে ওঠে।

কমলি ব্যাকুলভাবে ওর একটা হাত চেপে ধরে বলে, 'তাই কর ননীদা, তাই কর। এভাবে লোক ঠকিয়ে বেড়াতে আর ভাল লাগে না।'

ননী এদিক-ওদিক তাকিয়ে ওর হাতটা তুলে একবার নিজের গালে বুলিয়ে নিয়ে ছেড়ে দিয়ে সস্নেহ কৌতুকে বলে, 'কেন, তুই তো বলিস তোর খুব মজা লাগে?'

'সে প্রথম প্রথম লাগতো। মনে হতো লোকগুলো কী ভীতু! এখন ঘেন্না ধরে গেছে। মিছিমিছি মাথায় খানিক সিঁদুর লেপে যাকে তাকে গিয়ে ধরা—তুমি আমায় নষ্ট করেছ, তুমি আমায় বিয়ে করে রেখে পালিয়ে গিয়েছ, একি কম ঘেন্নার কথা?'

ননী আর একবার অপলক চোখে কমলির পরম সুশ্রী মুখখানার দিকে তাকিয়ে বলে, 'দেখ কমলি, তুই ওই কেষ্টমোহিনীর সত্যিকার বোনঝি নয় বলেই এসব তোর কাছে ঘেন্নার বস্তু। তোর দেহে যে ভদ্রলোকের রক্ত! যেটুকু পারছিস সে শুধু অন্নঋণে। কিন্তু মাসির হুকুম শুনতে হলে আরও কত লজ্জার হতো বল!'

'শুনতাম আমি!' ঝটকা মেরে উঠে দাঁড়ায় কমলি। দাঁড়িয়ে বলে, 'পৃথিবীতে মরবার কোন উপায় নেই?'

'এই—এই জন্যেই তোকে আমার এত ভক্তি হয় কমলি। এখন

শুনলে হাসবি হয়তো, কিন্তু আমিও একসময় বামুনের ঘরের ছেলে ছিলাম রে। ন'বছরে পৈতে হয়েছিল আমার, কানে এখনো বিঁধ আছে। পেটের জ্বালায় এখন আর জাত নেই!'

'না থাকে নেই। আপদ গেছে!'

হেসে ওঠে কমলি।

এবার ননীও প্রসন্ন হাসি হাসে। এমনি মেঘরৌদ্রের খেলাতেই বেঁচে আছে ওরা।

'ছবিখানা উপুড় করে রাখ কমলি, ওটাকে দেখছি আর গায়ে বিষ ছড়াচ্ছে আমার!'

'আহা মরে যাই, নিজেরই তো কীর্তি! কিন্তু কই ননীদা, তুমি একদিন তোমার সেই ডার্করুম না কোথায় যেন নিয়ে গেলে না তো আমায়? বলেছিলে যে, সেখানে নিয়ে গিয়ে বুঝিয়ে দেবে, কী করে দু'জায়গায় তোলা আলাদা ছবি এক করে বেমালুম পাশাপাশি ফটো করে দিতে পারো।'

'ডার্করুম তো আমারই ঘর রে কমলি। দরজা-জানলায় তেরপলের পর্দা লাগিয়ে অন্ধকার করে নিই। তোকে সেখানে?'

একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে ননী, 'ইচ্ছে তো খুব করে, কিন্তু— ভরসা হয় না।'

'ভরসা হয় না! কেন গো ননীদা? লোকনিন্দের ভয় বুঝি? কেউ কিছু বলবে?'

'দূর, লোকের ভারি তোয়াক্কা রাখি আমি। ভয় যে আমার নিজেকেই।'

'ধেৎ!'

'ধেৎ মানে?···আমি একটা রক্তমাংসের মানুষ নই? পুরুষমানুষ!

'তবু—তুমি যে খু-ব ভাল মানুষ ননীদা, মহৎ মানুষ!'

'ভারি যে লম্বা লম্বা কথা শিখেছিস ! 'মহৎ' 'বৃহৎ', বাসরে বাস্ !'

ননী হেসে ঘরের আবহাওয়া হাল্কা করে ফেলে,—'দেখবি চল, মাসি এখন কী কী বিশেষণ দিচ্ছে আমাকে। 'মুখপোড়া', 'লক্ষ্মীছাড়া, 'হতভাগা 'উনুনমুখো' !'

সম্মিলিত হাসির রোলে ঘর মুখর হয়ে ওঠে।

আর ওদিকে কেষ্টমোহিনী রাগে ফুলতে থাকে।

ননী তাদের অনেক উপকার করে সত্যি, তাদের লোক-ঠকানো ব্যবসার সহায়তাও করে ঢের। কিন্তু তাতে কি ? তাতে কেষ্টমোহিনীর লাভটা কোথায় ? ওই ননা মুখপোড়া আসরে এসে না দাঁড়ালে হয়তো বা এতদিনে কমলিকে টলানো যেত। তা'হলে তো পায়ের ওপর পা রেখে···এমন উঞ্ছবৃত্তি করে বেড়াতে হত ?···কিছু না হোক, থিয়েটারটা ? কোম্পানির লোক এসে কত সাধ্যসাধনা করেছে, এখনো দেখা হলে অনুযোগ করে। মেয়ে একেবারে কাঠকবুল। কবে ননী লক্ষ্মীছাড়ার চাকরি হবে—তবে ওঁকে বিয়ে করে রানী করে দেবে, সেই পিত্যেসে বসে আছেন। আরে বাবা, এই যা করে বেড়াচ্ছিস, এও তো থিয়েটার ! পাবলিক স্টেজে করলেই যত দোষ !···কত আশা করে তিন তিনশো' টাকা দিয়ে মেয়ে-ধরাদের কাছে কিনেছিলাম হারামজাদীকে !···অমন মুখ, অমন গড়ন, অমন গাওয়া ঘিয়ের মতন রং—সব বরবাদ ! ছি ছি !

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে খুব খানিকটা এলোমেলো ঘুরে একটা াড়ির রোয়াকে বসে পড়ল ইন্দ্রনাথ। হলেও শহর কলকাতা, তবু াত সাড়ে বারোটায় অকারণ অজানা রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো সমীচীন য়। পুলিসের চোখে যদিও বা না পড়ে, চোরের চোখে পড়ে যেতে পারে।

হাতে দামী ঘড়ি, দু আঙুলে দুটো মূল্যবান পাথরের আংটি, পাঞ্জাবিতে সোনার বোতাম, পকেটেও মুঠোখানেক টাকা।

মনটা চঞ্চল হলো।

যতক্ষণ রাস্তায় হাঁটছিল ততক্ষণ চিন্তার ধারাবাহিকতা ছিল না, শুধু একটা দুরন্ত বিস্ময়, আর একটা অপরিসীম অপমানের জ্বালায় সমস্ত মনটা জ্বলছিল।

এখন মনে হলো চলে আসাটা যেন বড্ড বেশী নাটকীয় হয়ে গেছে।

ঠিক যেন সিনেমার কোন নায়কের ভূমিকা নিয়েছে ইন্দ্রনাথ। সত্যি, পিসিমা মেয়েমানুষ, আর বাবা হচ্ছেন ভালমানুষ। কে কোন্ শয়তানির জাল বিস্তার করতে কী না কী বলে গেছে, বিশ্বাস করে বসেছেন।

তবু রাগ হয় বৈ কি!

ইন্দ্রনাথকে একবার জিজ্ঞেস করবারও প্রয়োজন বোধ করবেন না? অবাক হয়ে বলবেন না,—'এরা কে বলতো ইন্দু? তোকে ফাঁদে ফেলবার তালে বেড়াচ্ছে না কি?'

সত্যি!···কে তারা?

কে তারা?

কী অদ্ভুত কথা বলতে এসেছিল?

কত রকম প্রতারকের কত রকম প্রতারণার ভঙ্গি আছে এই কলকাতা শহরে, এও হয়তো তারই কোন এক নমুনা।

কিন্তু আশ্চর্য!

ফটো পেল কোথায়?

জীবনে কবে কোনদিন কোনো মেয়ের সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ফটো তুলেছে ইন্দ্র?

পিসিমার চোখে কি মন্ত্রপড়া ধুলোপড়া দিয়ে ধাঁধা লাগিয়ে গেল? …চিনতে ভুল করলেন পিসিমা?

ইন্দ্রর মুখ চিনতে পিসিমা ভুল করবেন?

কিন্তু কী আপ্‌সোস!

কী আপ্‌সোস, সেই হতচ্ছাড়া সময়টাতে ইন্দ্র বাড়িতেই উপস্থিত ছিল। স্বপ্নেও ধারণা করতে পারেনি সেই মুহূর্তে তার ঘরের কয়েক গজ দূরেই মৃত্যুবাণ রচিত হচ্ছে তার জন্যে।

পিসিমা যদি পর্দার অন্তরালে বসে না থাকতেন! যদি একবারের জন্যে বেরিয়ে এসে খোঁজ করতেন ইন্দ্র ফিরেছে কি না! যদি বলতেন 'ওরে ইন্দু, এসে দেখ তো এদের চিনিস কি না?'

ইন্দ্র যে তার নিজের সংসারে লাঞ্ছিত হল, অপমানিত হল, বিচ্যুত হয়ে এলো, এ সমস্ত অনুভূতি ছাপিয়েও অসহ্য একটা বিস্ময় ক্রমশ গ্রাস করছিল তাকে।

কে সেই মেয়ে!

কে সেই মেয়ে!

যে মেয়ে চোখের জলে ভেসে বলে, 'এই ছবিই তার সম্বল।' সোনার হার প্রত্যাখ্যান করে সেই ছবির বদলে!!

প্রতারকের প্রতারণাই যদি, তবে এমন কেন?

নগদ একশো টাকা, আর মাসোহারার প্রতিশ্রুতিটা নীহারকণা ইন্দ্রর কাছে বলবার অবকাশ পাননি। তাই হিসেব মিলোতে পারে

না ইন্দ্র।…জুয়াচোর যদি তো সোনার হার নেয় না কেন ?

আরও কিছুক্ষণ চিন্তার অতল গভীরে ডুবে যায় ইন্দ্র।

কী কুৎসিত আর কী অদ্ভুত অপবাদ !

ইন্দ্রনাথের আকৃতিধারী শিশুসন্তান নাকি তার কাছে !…কী লজ্জা, কী লজ্জা !

বাবা শুনেছেন !

লজ্জায় ঘৃণায় একা অন্ধকারে কানটা ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে ইন্দ্রনাথের। তারপর খানিকক্ষণ পর সবলে মনের সমস্ত জঞ্জাল সরিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

এখন রাতের আশ্রয় ঠিক করা দরকার।

হঠাৎ মনে পড়েছে আগামীকাল অফিসে একটা জরুরী মিটিং আছে। যথানির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছতেই হবে। এলোমেলো হয়ে পড়লে চলবে না।

রাতের আশ্রয় !

কিন্তু শুধুই কি আজকের এই অদ্ভুত রাতটার জন্য আশ্রয় ?

সারা জীবনের জন্য নয় ?

আচ্ছা—চিরদিনের সেই আশ্রয়টা সত্যিই চিরদিনের মত ত্যাগ করে এলো সে ?

সে রকম ভয়ংকর একটা অনুভূতি কিছুতেই মনে আনতে পারছে না ইন্দ্র। চেষ্টা করে ভাবতে গিয়েও কেমন ঝাপসা ঝপসা লাগছে। শুধু সাময়িক একটা অসুবিধে বোধ ছাড়া বিশেষ কোনও বোধ নেই।

কিন্তু এতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে ইন্দ্র ? এমনিই তো হয়। ভয়ংকর একটা ক্ষতি, প্রাণের প্রিয়জনকে হারানোর শোক, কিছুই কি ঠিক সেই মুহূর্তে অনুভব হয় ? তখন কি চেষ্টা করে করে মনে আনতে হয় না—'আমার সর্বস্ব গেল…আমার সর্বস্ব গেল !'

ক্ষতির অনুভূতি আসে দিনে দিনে, তিলে তিলে, পলে পলে।

তাই ইন্দ্রনাথ যতই মনে করতে চেষ্টা করে করুক, 'আমার আর নিজস্ব কোন আশ্রয় নেই, আমি গৃহচ্যুত সংসারচ্যুত, আমি নিঃসঙ্গ আমি একা,' ঠিক এই মুহূর্তে সেই সত্যটা সম্পূর্ণ গুরুত্ব নিয়ে দেখা দেয় না।

উঠে পড়ে ভাবে—দেখা যাক, সমাজকল্যাণ সঙ্ঘের কার্যালয়ের চাকরটাকে ঘুম ভাঙ্গিয়ে টেনে তোলা যায় কিনা। আজ রাতটা তো কার্যালয়ের অফিসঘরের সেই সরু চৌকিটায় স্থিতি!

তারপর আছে ভাগ্য আর ভবিষ্যৎ।

নীহারকণার নির্দেশে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলেন চন্দ্রনাথ, কিন্তু বেরিয়ে পড়ে এমন মনে হলো না যে কোনও পলাতক আসামীকে দৌড়ে গিয়ে ধরে ফেলবার জন্যে বেরিয়েছেন তিনি। বরং উল্টোই মনে হলো। মনে হলো চন্দ্রনাথ নিজেই বুঝি কোথাও চলে যাচ্ছেন। উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালিয়ে যাওয়া নয়, অন্যমনস্কভাবে কোনও লক্ষ্য স্থির না করে শুধু আস্তে আস্তে এগিয়ে যাওয়া।

চাকরবাকরগুলো আসছিল পিছনে, হাত নেড়ে বাড়ি ফিরে-যাবার ইশারা করলেন তাদের চন্দ্রনাথ, তারপর এগোতেই লাগলেন।

চাকরগুলো অন্ধকারেই রয়ে গেল। পিসিমার আচার আচরণ দেখে মনে হচ্ছে দাদাবাবুর কথাই ঠিক—হঠাৎ মাথা গরম-ই হয়েছে আর দাদাবাবু ডাক্তার আর বরফ আনতে গেছে। কিন্তু বাবুর আচরণ দেখে তো ঠিক তা' মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে এর ভিতরে কোনও রহস্য বর্তমান। কিন্তু কী সেই রহস্য?

নিয্যস্ বিকেলবেলা যে মাগী একটা ছুঁড়ি আর একটা ছোট ছেলেকে নিয়ে এসেছিল, এ সেই তাদেরই কারসাজি। একটা কোন অঘটন ঘটেছে কোথাও কোনখানে।

চন্দ্রনাথ এগোতে এগোতে ভাবছেন, জীবনের কোন ঘটনাটা মানুষের অজ্ঞাত নয়? এই যে চন্দ্রনাথ এখন এই গভীর রাত্রির নির্জনতায় একা চলেছেন, এ কি কিছুক্ষণ আগেও ভাবতে পেরে-ছিলেন? কোনদিনই কি ভাবতে পারতেন, রাত বারোটায় একা একা পথ চলছেন চন্দ্রনাথ—হেঁটে হেঁটে, গায়ে গেঞ্জি, পায়ে চটি।

চলতে চলতে সহসা মনে হলো এই যে এগিয়ে যাচ্ছেন, এটা যেন

চন্দ্রনাথের সারা জীবনেরই একটা প্রতীক। সমস্তটা জীবন তো এমনি করেই পার হয়ে এলেন চন্দ্রনাথ, নিঃসঙ্গ নির্জন। জীবনের লক্ষ্য ?···তাই বা কই ? কবে কি ভেবেছেন তেমন করে !

ছেলেটাকে, একমাত্র সন্তানকে একটা মানুষের মত মানুষ করে তুলবো, এমন কোন আদর্শ কি কখনো চন্দ্রনাথের মধ্যে কাজ করেছে ?

—না, মনে করতে পারলেন না।

ছেলেকে প্রাণ ভরে ভালই বেসেছেন, তার সম্পর্কে চিন্তা করেননি কোনদিন।

অর্থোপার্জন ? সেটাই কি জীবনের লক্ষ্যবস্তু ছিল চন্দ্রনাথের ? তাই বা বলা যায় কই ? উপার্জন অবশ্য করেচেন প্রচুর, কিন্তু সেটা পরম একটা লক্ষ্য হিসেবে কি ? নিঃসঙ্গ জীবনে কর্মের একটা নেশা ছিল, তাই কর্মক্ষেত্রে চলে এসেছেন নির্ভুল নিয়মে, এবং তার পুরস্কার যথেষ্ট পেয়েছেন এই পর্যন্ত।

খুব বড়লোক হবো, সমাজের উঁচু চূড়োয় উঠে বসবো, এ সব সখসাধ চন্দ্রনাথের কখনো ছিল না। কাজ দিয়ে ভরে রাখা মন ঘরে ফিরে এসে চেয়েছে একটু বিশ্রাম, একটু আরাম, একটু শান্তি। পেয়েছেন সেটুকু, ব্যস্ আর কি ?···আর কী চাইবার আছে জীবনে ?

এইটুকু যে পাচ্ছেন তার জন্যই যেন কৃতজ্ঞতা বোধের অন্ত নেই। ভগবানের প্রতি, সংসারের প্রতি, সর্বোপরি নীহারকণার প্রতি এক অপরিসীম কৃতজ্ঞতা নিয়ে জীবনটাকে কাটিয়ে দিলেন। সে জীবনে আর কিছু চাইবার আছে এটাও যেমন কোনদিন অনুভব করেননি, তেমনি খেয়াল করেননি, তাঁর আরও কিছু করবার আছে।

আজ এই নির্জন রাস্তায় চলতে চলতে মনে হলো চন্দ্রনাথের আরও কিছু করবার ছিল।···ছিল ছেলেকে জানবার।

অনেকক্ষণ রাস্তায় ঘুরে ঘুরে যখন চন্দ্রনাথ বাড়ি ফিরে এলেন,

তখন আর একবার মনে হলো তাঁর অন্তত এতটুকুও জেনে রাখবার ছিল, ইন্দ্রনাথের সমিতির ঠিকানা কী। স্থির বিশ্বাস সেখানেই গেছে। নইলে ?···আত্মহত্যা ?

না, নীহারকণার মতো অতটা দূর পর্যন্ত ভেবে উঠতে পারছেন না চন্দ্রনাথ।

আজ রাত্রে আর কোন উপায় নেই। কাল, হ্যাঁ কাল বেলা দশটার পর খোঁজ করবার হদিস মিলতে পারে। যেখানেই চলে যাক রাগ করে, হয় তো অফিসে আসবে।

মন বলছে খবর সেখানেই পাওয়া যাবে।

সত্যিই তো আর জীবনটা মঞ্চের নাটক নয় যে, এই মাত্র যে ছিল সে 'চললাম' বলে চলে গেল, আর জীবনে তার সন্ধান পাওয়া গেল না!

ননী চলে যাওয়ার পর কমলা অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল চৌকিটায়।

ননীর জন্যে মনটা মমতায় গলে যাচ্ছে। কী বেচারী লোকটা! সামান্য একটা চাকরির জন্যে মাথা কুটে ফেলছে, তবু জুটছে না।

জুটবেই বা কী করে, বিদ্যে সাধ্যি না থাকলে কি আর এ যুগে কাজ জোটে? শুনতে পাওয়া যায় আগেকার আমলে নাকি কাণাকড়ার বিদ্যে সম্বল করে মস্ত মস্ত অফিসের বড়বাবু হতো। একালে পাস না করলে অফিসের পিয়নটি পর্যন্ত হবার জো নেই।

বেচারী ননীদা শুধু 'জমা' দেবার টাকার অভাবেই নাকি একটা পাস দিতে পারেনি। কমলার সঙ্গে ভাগ্য জড়িত করতে চেয়েছে বলেই বুঝি ননীর এই দুর্ভাগ্য।

ননী অবশ্য সে কথা মানে না। সে বলে ভাগ্যকে সে এখনি ফিরিয়ে তুলতে পারে, যদি সামান্য কিছুও মূলধন জোটাতে পারে। ব্যবসার ঝোঁক তার, বলে ছোট্ট একটু ব্যবসা থেকেই কত বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। বলে 'কমলা'কে একবার ঘরে পুরে ফেলতে পারলেই চঞ্চলা কমলা উথলে উঠবেন তার সংসারে। শুধু সামান্য একটু মূলধন! —কিন্তু কোথায় সেই 'সামান্য'টুকুও?

কমলা যে ঘেন্না লজ্জার মাথা খেয়ে লোক ঠকিয়ে অপবাদ অপমান মাথায় বয়ে উপার্জন করে আনে, তার থেকে কি একটা টাকাও হাতে পায়?

না, কমলাকে কেষ্টমোহিনী পাই পয়সাটিও দেয় না।

অথচ সত্যিই কিছু আর সব টাকা কমলার ভাত কাপড়ে যায় না।

তা' সেদিক থেকে তো দেখে না কেষ্টমোহিনী, দেখে অন্য দিক

থেকে। তার মতে কেষ্টমোহিনীর নির্দেশক্রমে চললে যে টাকাটা ঘরে আনতে পারতো কমলা, (কেষ্টমোহিনীর মতে সেটা হচ্ছে মোট মোট টাকা) সেই টাকাটা অবিরতই লোকসান যাচ্ছে। অতএব কমলার দ্বারা যে টাকা রোজগার হচ্ছে, সেটা কিছুই নয়। তবে আর তার থেকে ভাগ চাইবে কমলা কোন ধৃষ্টতায় ?

উঠতে বসতে কেষ্টমোহিনীর গঞ্জনা, ননীর ওই হতাশ ম্লানমুখ, আর প্রতিনিয়ত মিথ্যা প্রতারণার জাল ফেলে ফেলে টাকা উপায়ের চেষ্টা, এ যেন কমলার জীবন তুর্বিসহ করে তুলেছে।

কোথায় আলো···কোথায় পথ···?

যদি তার জীবনে ননী না থাকতো, যদি না থাকতো ননীর ভালবাসা, তাহলে হয়তো কবেই এই জীবনটাকে শেষ করে দিত কমলা গলায় দড়ি দিয়ে কি বিষ খেয়ে। সে ধরনের মৃত্যু কমলা জ্ঞানাবধিই দেখছে। এই তো এই বছর খানেক আগে লতিকা ম'লো বিষ খেয়ে। সে কী কাণ্ড!

পুলিস এল, বাড়িসুদ্ধু সকলের সাক্ষী নেওয়া হলো, লতিকার মাকে ধরে নিয়ে থানায় চলে গেল, কত ঝঞ্ঝাট। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই প্রমাণ করা হয়েছিল সেই দিনই অর্থাৎ সেই রাত্রেই একটা অজানা অচেনা লোক এসেছিল লতিকার কাছে, সেই নরপিশাচটাই লতিকার গায়ের গহনার লোভে বিষ খাইয়ে সব নিয়ে-থুয়ে সরে পড়েছে। সেই প্রমাণেই লতিকার মা ফিরে এল থানা থেকে, আর চীৎকার করে কাঁদতে বসে, 'ওরে কে আমার এমন সর্বনাশ করলো রে, আমার সোনার পিতিমেকে বিষে নীল করে দিয়ে গেলো রে—'

কিন্তু কমলা জানে এ সমস্তই বানানো কথা। কোন নতুন লোকই আসেনি সেদিন। আর কমলা নিজে দেখেছে মরে যাওয়ার পরও লতিকার গায়ে তার সব গহনাই ছিল। প্রথমটা আচমকা চেঁচামেচি

শুনে বাসার সব বাসিন্দে হুড়মুড়িয়ে ছুটে গিয়েছিল, কমলাও গিয়েছিল। কিন্তু তারপরই লতিকার মা আর দিদিমা চেঁচাতে লাগল, 'তোমরা সব ভিড় ছাড়ো গো ভিড় ছাড়ো, দেখি বাছার আমার জ্ঞান চৈতন্য আছে কি না।'

সকলেই একটু পিছু হটে এসেছিল, তার খানিক পরেই ফের পরিত্রাহি চীৎকার—'ওগো কিছু নেই কিছু নেই, বিষে জ'রে গেছে বাছা আমার!'

অতএব এবার তোমরা ভিড় করতে পারো।

কমলা দেখে তখন অবাক হয়ে গিয়েছিল লতিকার গায়ে সোনারত্তি বলতে কিছু নেই। আর লতিকার মা ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছে, 'কোন্ নর-পিচেশ চামার এসেছিল গো,—তুচ্ছ একটু সোনার লোভে আমার সোনার পিতিমেকে শেষ করে গেল।···ওরে তুই কেন চাইলিনে?'

অবাক হয়ে গিয়েছিল কমলা এই অদ্ভুত মিথ্যা প্রচারে! অনেক হাঙ্গামার হাত এড়াতেই যে এই ভয়ংকর মুহূর্তেও এমন গল্প বানিয়ে ফেলল লতিকার মা, তা বুঝতে দেরি লেগেছিল কমলার।

কমলা বুঝেছিল, বিষ লতিকা নিজেই খেয়েছে। কমলার চাইতে বয়সে কিছু বড় হলেও মনের প্রাণের কথা কমলার কাছে বলতো লতিকা। বলতো, 'তুই-ই ধন্যি মেয়ে কমলি, ওই জাঁহাবাজ কেষ্টমাসির কাছেও খোট্ বজায় রেখেছিস। ইচ্ছে হয় যে তোর চন্নামেত্তর খাই। কী ঘেন্নার জীবন আমার। নিজের মায়ের কাছেও ছাড়ান নেই! মাঝে মাঝে মনে হয় কমলি, বিষ খেয়ে এ ঘেন্নার প্রাণ শেষ করে ফেলি।'

কমলা সান্ত্বনা দিতে পারত না। শুধু মাঝে মাঝে বলতো, 'কে জানে লতিকাদি—ও তোমার সত্যি মা কি না। হয় তো তোমাকেও প্রফুল্লমাসি পয়সা দিয়ে কিনেছে। আমার যেমন মাসি, তোমার তেমন মা।'

হয়তো এইটুকুর মধ্যেই রাখতে চাইত অনেকখানি সান্ত্বনা। যে মানুষটা লতিকার মর্মান্তিক অপমানের মূল সে অন্তত লতিকার মা নয়, লতিকা নিজে নয় এই কুৎসিত কুলোদ্ভব! এই শুধু।

এর বেশি আর কী দিতে পারবে কমলা।

লতিকা কিন্তু বিষণ্ণ হাসি হাসতো।

মাথা নেড়ে বলতো, 'দূর, মা দিদিমা সব আমার চিরকালের। তাই তো ভাবি কমলি, তোর তবু মনে একটা সান্ত্বনা আছে—তোকে কিনে এনে চুরি করে এই নরকে এনে ফেলেছে, কিন্তু আমার যে ওপর ভেতর আগুনের জ্বালা! এই নরকেই আমার উৎপত্তি। যখন ভাবি তখন মনে হয় গলায় ছুরি দিই, বিষ খাই, জলে ঝাঁপাই কি আগুনে পড়ি।...তাই কি স্বাধীনতা আছে? চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা।...মা নামে আমার ঘেন্না কমলি।'

লতিকার এ মৃত্যু যে আত্মহত্যা, এতে আর সন্দেহ ছিল না কমলার।

হয়তো কমলাও কবে কোনদিন এমনি করে নিজেকে শেষ করে ফেলত, যদি না ননীদা...

ননীদা-ই জব্দ করে রেখেছে কমলাকে।

কিন্তু আর কতদিন এই কাঁটাবনের মাঝখান দিয়ে হাঁটবে কমলা? কবে পাবে সত্যিকার একটা পথ! যে রকম পথ দিয়ে সত্যিকার মানুষরা হাঁটে!

এ বাড়িতে আরও কত ঘটনাই ঘটে, যা কমলা বোঝে কোনও সত্যিকার মানুষদের সংসারে ঘটে না, কিছুতেই ঘটতে পারে না; মন গ্লানিতে ভরে আসে, ক্লেদাক্ত হয়ে ওঠে, তবু এই পরিবেশের মাঝখানেই পড়ে থাকতে হয় কমলাকে।

তাই না নিজেকে কিছুতেই সত্যিকার মানুষ ভাবতে পারে না কমলা।

একা বসে থাকলেই—

স্মৃতির অতল তলায় তলিয়ে গিয়ে, ডুবে যাওয়ার মতই রুদ্ধশ্বাস বক্ষে মনে আনতে চেষ্টা করে কমলা সেই তার অজ্ঞাত শৈশবকে!

কী ছিল সে?

কে ছিল?

কাদের মেয়ে?

নির্মল পবিত্র সত্যিকার কোন মানুষদের!

হয়তো পথে ঘাটে এখানে সেখানে কমলার সেই পূর্বজন্মের মা বাপ ভাই বোনেরা কমলারই সামনে দিয়ে হাঁটছে চলছে বেড়াচ্ছে। কমলা চিনতেও পারছে না। তারাও তাকিয়ে দেখছে না তাদের এই একদা হারিয়ে যাওয়া মেয়েটার দিকে। আর তাকিয়ে দেখলেই বা কী! চিনতে পারবে না কি? গল্প উপন্যাসেই শুধু দেখা যায় সেই গল্পের মানুষরা অনেক···অনেক বছর পরে তাদের হারানো ছেলেমেয়েদের সন্ধান পায়, দেখা হয়। মিলন হয়। সব ফাঁকি, সব বাজে, মানুষের জীবনে ও রকম কিছু হয় না।

তবু মাঝে মাঝে নিতান্ত সস্নেহে কমলা তার ডান হাঁটুর নিচের ছোট্ট জড়ুলের দাগটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। এই রকম একটি তিল কি জড়ুল চিহ্ন ধরেও নাকি অনেক সময় পরিচয় প্রমাণিত হয়।

আচ্ছা, কমলা যখন হারিয়ে গিয়েছিল তখন তার সেই জন্মদাত্রী মা কী করেছিল? শুধু দু'চারদিন কেঁদেছিল? শুধু দু'চারদিন হায় হায় হায় করেছিল?—ব্যস্, তারপর ছোট্ট মেয়েটাকে ভুলে গিয়ে

নিশ্চিন্ত হয়ে খেয়েছে ঘুমিয়েছে বেড়িয়েছে, অন্য ছেলেমেয়েদের আদর যত্ন করেছে!

এই কথাটা ভাবতে গেলেই বুকের মধ্যে হু' হু' করে ওঠে কমলার, ছলাৎ করে এক ঝলক জল এসে যায় চোখের কোণায়।

একই ঘরে জন্মে তারা কত সুন্দর পবিত্র আর কমলা ছিটকে এসে পড়েছে কী পাঁকের মধ্যে!

মাঝে মাঝে 'অন্য ছেলেমেয়ে' হীন একটি ঘরের ছবি কল্পনা করতে চেষ্টা করে কমলা।...শূন্য ঘর খাঁ খাঁ করছে, আর আজও একমাত্র সন্তানহারা ছুটি প্রাণী কেঁদে কেঁদে মাটি ভিজোচ্ছে।...হয়তো বুকে করে তুলে রেখেছে ছোট্ট একজোড়া লাল জুতো, ছোট্ট ছু একটি ফ্রক পেনি! কিন্তু এ কল্পনায় জোর পায় না কমলা। তেমন হলে কি আর তাঁরা খুঁজে বের করত না তাদের সেই হারানো মানিককে? স্বর্গ মর্ত্য পাতাল তোলপাড় করে!

না না, কেউ কমলাকে মনে করে নেই, কেউ কমলার কথা ভাবে না আর। সে ঘর থেকে হারিয়ে গেছে কমলা। ইটকাঠের ঘর থেকে, মনের ঘর থেকে।

আশ্চর্য!

জগতে এত মেয়ে আছে, সবাইয়ের মা-বাপ আছে, ভাইবোন আছে, পরিচয়ের একটা জগৎ আছে। নেই শুধু কমলার!

হ্যাঁ হারিয়েও যায় অনেকে।

বাংলা খবরের কাগজে এ রকম অনেক যে দেখেছে কমলা নিরুদ্দেশের পাতায়। কিন্তু হারিয়ে গিয়ে কমলার মত এমন খারাপ জায়গায় এসে পড়ে কেউ?

কেউ না। কেউ না।

কমলার মত হতভাগী জগতে আর কেউ নেই।

বড় ইচ্ছে করে কোনও ভাল গণৎকারকে হাতটা একবার দেখায়। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব যিনি বলে দিতে পারেন হাতের ওই আঁকি-বুকি গুলো থেকে। কমলার হাতের রেখা দেখেই বলে দেবেন কোথায় তার সেই জন্মদাত্রী মা, কোথায় তার আত্মীয়-পরিজন, কি তাদের ঠিকানা! বলে দেবেন কী নাম ছিল কমলার সেই আগের জন্মে, কেমন করে হারিয়ে গেল সে কেন্দ্রচ্যুত হয়ে, আর কেমন করেই বা এখানে এসে পড়ল!

কিন্তু কোথায় তেমন ত্রিকালজ্ঞ জ্যোতিষী?

কে তার সন্ধান এনে দেবে কমলাকে?

কে তাঁর কাছে নিয়ে যাবে কমলাকে।

ননীদা বলে এরকম নাকি আছেন, কিন্তু ননীদা জানে না কোথায় আছেন। কাজেই সে শুধু স্বপ্নই থেকে গেছে। কমলার অতীতও অন্ধকার ভবিষ্যৎও অন্ধকার।

আর বর্তমান?

সে বুঝি একেবারে আলোকোজ্জ্বল···?

প্রতিনিয়ত অঙ্কুশের তাড়না, প্রতিনিয়ত যমযন্ত্রণা।

মাসি যদি সর্বদা অমন কটু-কাটব্যও না করতো! যদি শুধু পাখী পোষা বেড়াল পোষার মত কমলাকে শুধু পুষেই ক্ষান্ত থাকতো!

কিন্তু তা হবার নয়।

অহরহ পোষার খরচা উসুল করে নিতে চায় কেষ্টমোহিনী। অহরহ সেই একমুঠো ভাতের খোঁটা দিয়ে দিয়ে সচেতন করিয়ে দিতে চায় কমলাকে। কমলা বিদ্রোহ করতে চাইলে তীব্র ভাষায় স্মরণ করিয়ে দেয়,—'খাচ্ছিস পরছিস, ঘরতলায় মাথা দিয়ে আছিস, তার দাম নেই?'

তাই দাম দিতে হয় কমলাকে।

এক এক সময় ইচ্ছে হয় কমলার যেখানে দু চোখ যায়, চলে যায়।

কিন্তু সাহস হয় না। কোথায় যাবে?

কমলার বয়সী একটা মেয়ের পক্ষে পৃথিবী যে কী ভীষণ সে তো আর জানতে বাকি নেই তার।

বড় দুঃখেই শিখেছে।

দুঃখের বাড়া শিক্ষক নেই।

তা ছাড়া ননী!

আহা ননী যদি একটা ফটোর দোকানেও কাজ পেত!

কী করে কোন্ ফাঁকে কার সঙ্গে না কার সঙ্গে মিশে ফটো তোলার কাজটা বেশ শিখে ফেলেছিল ননী, ছোট্ট একটা বক্স-ক্যামেরাও আছে তার। আছে ছবি প্রিণ্ট করার মালমসলা। আর সকলের ওপর আছে ননীর ওই বিদ্যের সঙ্গে অদ্ভুত এক কৌশল।

নইলে—

কী ভেবে আবার সেই ফ্রেমে-বাঁধানো 'যুগল ছবি'টা হাতে তুলে নিল কমলা।

আশ্চর্য···অদ্ভুত!

কী করে করেছে? কে বলবে সত্যি কোন সদ্য বিয়ের বরক'নের ছবি নয়!—সেই ক'নে হচ্ছে এই হতভাগী কমলা, আর বর এক দেবকান্তি রাজপুত্তুর।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন নেশার মত লাগে কমলার, মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে। কিন্তু শুধু কি আজই? রোজই এমন হয়।

কী যে মোহিনী মায়া আছে ফটোটায়, দেখে দেখে যেন আর আশ মেটে না।

দেখে দেখে শরীর অবশ হয়ে আসে, চোখ ফেটে জল আসতে চায়।

লুকিয়ে তুলে রাখে, আবার এক সময় বার করে দেখে। ছবিটা নিয়ে এ এক মধুর রহস্যময় খেলা কমলার।

কী অপরূপ লাবণ্যে ভরা ওই মুখখানা, যে মুখ কমলার ছবির মুখের পাশাপাশি থেকে মানুষ কমলার চোখের দিকে গভীর দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে।

গভীর গম্ভীর কোমল দৃষ্টি। এ দৃষ্টি যেন সকরুণ স্নেহে সমবেদনা জানায়, আবার অন্তরের অন্তঃস্তল পর্যন্ত দেখে ফেলে ধিক্কার দেয়।

না, এত স্পষ্ট করে এত কথা ভাবতে জানে না কমলা, শুধু তার মনের মধ্যে অস্পষ্ট বাষ্পের মত এমনি একটা আনন্দ আতঙ্ক, শ্রদ্ধা সমীহের অপরিচিত অনুভূতি পাক খেতে থাকে।

এ মানুষটাকে তো প্রত্যক্ষ দেখেছে কমলা, মাঝে মাঝেই দেখেছে, কই এমন বিভোর হয়ে যায়নি তো?···কমলা কি এই ছবিটার প্রেমে পড়ে গেল নাকি? না, আগে যখন প্রত্যক্ষ দেখেছে, দেখেছে দূর থেকে। মানুষটা তখন সুদূর আকাশের তারা। জানতো—উজ্জ্বল ঝক্‌ঝকে সেই মানুষটা বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে বক্তৃতা দেয়, স্বাস্থ্যশিক্ষা দেয়, ওষুধ দেয়, পথ্যি দেয়, কেউ খেতে না পেলে তার ভাতের ব্যবস্থাও করে দেয়।

দেখেছে তাদের এই কলোনির মধ্যে ঘুরে ঘুরে নাইট-ইস্কুল বসাতে, রাস্তাঘাট ভাল করবার জন্যে কর্পোরেশনে দরখাস্ত দেবার জন্য পাঁচজনের সইস্বাক্ষর জোগাড় করতে, দেখেছে অনেক লেখালেখি করে রাস্তায় দু'দুটো টিউবওয়েল বসিয়ে দিতে।

ননীদা যখন এই লোকটার ফটো নিয়ে এসে বলেছিল, 'এই দেখ কমলি, মার দিয়া কেল্লা। আর একটি নতুন শিকার! কেমন স্পষ্ট পরিষ্কার ছবিখানা নিয়ে নিলাম, টেরও পেল না। মহা উৎসাহে

লেক্‌চার দিচ্ছিলেন বাবু, ভিড়ের মধ্যে কখন যে শ্রীযুক্ত ননীবাবু তাঁর দফা গয়ার ব্যবস্থা করে ফেললেন, জানতেও পারল না !'···মনটা তখন খারাপ হয়ে গিয়েছিল কমলার। মনে হয়েছিল, আহা,—অমন ভাল লোকটার নামে কালি দেওয়া ? আর সে কালি লাগাবার ভার পড়বে এই কমলির ওপরেই।

কিন্তু মুখ ফুটে প্রতিবাদ করতে কমলার লজ্জা করেছিল। শুধু বলেছিল, 'জানাজানি হলেই বা কী ? যারা লেক্‌চার দিয়ে বেড়ায় তাদের ফটো তো খবরের কাগজওলারাও নেয়।'

'তা নেয় বটে। সেই সাহসেই তো নিশ্চিন্তি হয়ে বুকে ক্যামেরা ঝুলিয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়াই।'

তারপর সসঙ্কোচে ব্যক্ত করেছিল কমলা হৃদয়ের মৃত্যু প্রতিবাদ।

'এত ভাল ভদ্রলোক, সকলের কত উপকার করছেন দেখতে পাই, ওঁকে কেন বাপু—'

কথা শেষ করতে দেয়নি ননী, খিঁচিয়ে উঠেছিল, 'থাম কমলি, মেজাজ খারাপ করে দিসনি। ভদ্রলোক ! ভাল লোক ! বস্তিতে কলোনিতে লেক্‌চার দিয়ে বেড়ানো লোক আমি নতুন দেখছিনে। যত সব মতলববাজের দল। নিশ্চয় সামনের বছর ইলেকশানে নামবে। এখন তাই দেশের গরিবত্বঃখীদের জন্যে কুমীরকান্না কেঁদে বেড়াচ্ছে। এইসব লোককেই পাঁকে পুঁতে দিতে হয়, বুঝলি কমলি !'

বলতে বলতে রাগে ফুলে উঠেছিল ননী, 'এরা আমাদের মতন গরিবদের 'হ্যান করব, ত্যান করব' বলে তুটো মিষ্টি কথা আর একটু মুষ্টিভিক্ষেয় ভুলিয়ে ভোটের ব্যবস্থাটি করে নিজের কার্যসিদ্ধি করে নেয়, আমাদের মই বানিয়ে উঁচু গাছের মগডালে চড়ে বসে, তারপর আর আমাদের চিনতে পারে না। এই পাঞ্জাবি উড়িয়ে বেড়ানো 'উপকার করা বাবু গুলোকে' দেখলেই তাই গা জ্বালা করে আমার ! ওর মুখে চুনকালি পড়ুক তাই চাই আমি। আর তাতে পাপও নেই।

এসব লোকের চরিত্রই কি ভীষ্মদেব হয় নাকি? হয়তো খবর নিলে জানবি আরও কত কেষ্ট ঠাকুরালি করে বেড়িয়েছে।'

তবু কমলা সসঙ্কোচে বলেছিল, 'এঁকে কিন্তু তেমন মনে হয় না ননীদা।'

'নাঃ, মনে হয় না। ওর কার্তিকের মতন চেহারা দেখে বুঝি মন গলে গেছে? এই তোকে বলে রাখছি কমলি, এ জগতে দেখতে পাবি যে যত দেবদূতের মতন দেখতে, সে তত ফেরেববাজ। তুই যদি ওর চেহারা দেখে—'

'আমি ওকে দেখিইনি ভাল করে।' কমলা বলেছিল তাড়াতাড়ি ভয়ে ভয়ে।

'আর দেখতে হবেও না। ওকেই দেখিয়ে দিবি। খুব শাঁসালো ঘরের ছেলে, বেশ কিছু আদায় করা যাবে।'

কমলা ম্লান মুখে বলেছিল, 'আমার কিন্তু বড্ড ভয় করে ননীদা। প্রত্যেকবারই ভয় করে। ···সত্যি সত্যি যদি কেউ পুলিসে ধরিয়ে দেয়? তখন তো সব জোচ্চুরি ধরা পড়ে যাবে? জেলে যেতে হবে আমাদের।'

'পুলিসে দেবে না।' ননী একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হাসে। 'জানি আমি!—বড়লোকদের বদনামের ভয়টা বড্ড বেশি। মহা মিথ্যে বলে বুঝলেও পুলিস জানাজানি করে সমাজে মাথা হেঁট হতে চায় না। তাই 'চারটি টাকা দিলে যদি মেটে তো মিটুক' বলে ঘুষ দেয়।'

'সত্যিকথা প্রকাশ হলে সমাজে মাথা হেঁট হবে কেন ননীদা?'

'কেন?'

হো হো করে হেসে উঠেছিল ননী, 'তুই এখনো নেহাৎ ছেলেমানুষ আছিস কমলি। সমাজ কি সত্যি কথাকে 'সত্যি' বলে বিশ্বাস করবে? কেউ করবে না। বাপ ছেলেকে বিশ্বাস করবে না, ছেলে বাপকে বিশ্বাস করবে না। তা' ভাই বন্ধু আত্মপর তো দূরের

কথা। যতই ধর্মের জয়—অধর্মের পরাজয় হোক, লোকে ভাববে পুলিসকে হাত করে ডঙ্কা বাজিয়ে জিতে গেল। অথচ কেলেঙ্কারির চূড়ান্ত হবে, ঢাকে ঢোলে কাঠি পড়বে, খবরের কাগজওলাগুলো জেনে বুঝেও কায়দা করে রংচং চড়িয়ে খবর ছাপবে। জানে তো সবই। সবাই জানে। তাতেই তো মাসিকে আর তোকে এই পথ ধরিয়েছি। তবে সাবধান, মাসিকে সঙ্গে করে ভিন্ন এক পা নড়বি না। একলা পেলেই মেরে গুমখুন করে ফেলবে।'

নিশ্বাস ফেলে চুপ করেছিল কমলা।

তারপর ননী এক অদ্ভুত কাজ করলো।

কোথা থেকে কিনে নিয়ে এল একসেট ফুলের গহনা। বললো, 'তোর সব থেকে ভাল শাড়িটা আর এইগুলো পরে নে কমলি।

'সে কি গো ননীদা! না না, এমন সং সাজতে পারবো না আমি।'

'সং কী রে? রানী, রানী!' কেমন একটা হতাশ হতাশ মুখে বলেছিল ননী, 'রটাতে হবে রাজপুত্তুর তোর গলায় মালা দিয়েছে, তা একটু রানী রানী না দেখালে মানাবে কেন? এ ছবি বাছাধনের মাকে দেখালেই তাঁর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। একেবারে বিয়ের বরক'নের যুগল ছবি।'

'যুগল ছবি' কথাটা ননীর কাছেই শোনা কমলার।

সত্যিই ক'নে সেজেছিল সেদিন কমলা।

ফটো তোলার পর ননী আবেগ আবেগ গলায় বলেছিল, 'এ ছবি আমার কাছে রেখে দেবে একখানা। কী করবো রে কমলি অনেক যে খরচা, নইলে কত ছবি তুলতাম তোর!'

ছবিখানা তুলে রাখতে গিয়ে আবার একবার চোখের সামনে ধরে বসে রইলো কমলা।

ওই চোখ দুটো কি তাকে ভৎ´সনা করছে!

বলছে, ছি ছি, তুমি এমন নীচ? এত ইতর?

সেদিন ওদের বাড়িতে গিয়েও যেন এমনি হয়েছিল কমলার। মনে হচ্ছিল সমস্ত বাড়িখানা তার আসবাবপত্র শোভা-সৌন্দর্য সমেত যেন অনবরত ভৎ´সনা করছে—ছি ছি, তুমি এমন নীচ!

তিনতলায় উঠে তো ভয়ে প্রাণ উড়ে গিয়েছিল কমলার।

এ কী!

মাসি আর ননীদা কি পাগল?

ওইখানে, ওই ঘরে ঢুকে বলতে হবে, 'তোমাদের ছেলে এই কমলাকে বিয়ে করেছে।' যে কমলা দুখানার বেশি চারখানা শাড়ি কোনদিন পরেনি, দুবেলার বেশি চারবেলা কখনো খেতে পায়নি! আর যার পিঠের জামা খুললে এখনো কেষ্টমোহিনীর হাতের মারের দাগ খুঁজে পাওয়া যায়! এর আগে এত বড় জায়গায় কখনো আসেনি কমলা।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই ভয়ংকর অসম্ভব কথাটা বলা হয়েছিল।

আর মিলে গিয়েছিল ননীদাদের হিসেবটাই।

ওই ইন্দ্রবাবুর পিসিমা 'এই মারি এই মারি' করেও শেষ অবধি বিশ্বাস করেছিলেন।

কেষ্টমোহিনীর হাতে ধরে বলেছিলেন, 'দেখো ভাই, একথা যেন সাত কান না হয়। তোমার মেয়ে আর নাতির কষ্ট যাতে না হয় সে ব্যবস্থা আমি করবো। আর এই একটু মিষ্টি খেও—' বলে সেই হাতে গুঁজে দিয়েছিলেন একশোখানি টাকা।

ননীদাদের হিসেবটাই ঠিক।

স্ত্রীপুরুষ সম্পর্কিত ব্যাপারে জগতে কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না।

কিংবা—কিংবা—ননীদার সে কথাটাও হয়তো সত্যি। হয়তো স্বভাব-চরিত্র ভালই নয় ওর, তাই ওর পিসি এত সহজেই…

কমলারা অবশ্য 'বিয়ে' শব্দটা ব্যবহার করে। কিন্তু সমাজকে লুকিয়ে যে বিয়ে, তাকে কি আর লোকে সত্যি বিয়ে বলে সম্মান দেয়?

হঠাৎ ছবিখানা বিছানার তলায় গুঁজে রেখে দিল কমলা। ক্রমশ যত দেখছে তত যেন গা ছমছম করছে।

আস্ত লোকটাকে আর একবার পাওয়া যায় না?

দূর থেকে!···অনেক দূর থেকে!

'খোঁজ পেলি না চন্দর ?'

ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন নীহারকণা।

সে রাত্রে নয়, তার পরদিন দুপুরে।

চন্দ্রনাথ বিছানায় বসে পড়ে গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, 'পেয়েছি।'

'পেয়েছিস !...অ্যাঁ ! পেয়েছিস ? তবে একলা এলি যে ? ও চন্দর অমন গুম্ হয়ে রয়েছিস কেন ? কোথায় রেখে এলি তাকে ? হাসপাতালে না—'

শেষ পরিণামের শব্দটা আর উচ্চারণ করেন না নীহারকণা। হাঁপাতে থাকেন।

চন্দ্রনাথ হাত তুলে শান্ত হবার ইশারা করে বলেন, 'রেখে কোথাও আসিনি, দেখে এলাম—তার অফিসে। কাজ করছে।'

'অফিসে কাজ করছে। আঃ নারায়ণ ! বাবা বিশ্বনাথ ! মা মঙ্গলচণ্ডী !...আসবে তো সন্ধ্যেবেলা ? আসবে না তো আর যাবে কোথায় ! রাগ আর কতকাল থাকে মানুষের।—তা, কাল রাত্তিরে ছিল কোথায় হতভাগা ? রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছিল বোধহয়।'

হাসি আর কান্নার এক অপূর্ব রামধনু রঙে উথলে ওঠে নীহারকণার মুখ।

'রোস রোস, একে একে তোমার কথার উত্তর দিই।'

'কী বললে ? কাল রাত্তিরে ছিল কোথায় ? ছিল ওদের সেই সংঘের অফিসঘরে। তারপর—কী বললে ? কতক্ষণ রাগ থাকে মানুষের ? বলা যায় না, হয়তো চিরকাল। সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরবে কিনা ?...না, ফিরবে না।'

'ফিরবে না !'

'না।'

'ভুলের মাপ নেই?'

'মাপ চাইনি।

খানিকক্ষণ নিঃসীম স্তব্ধতা। তারপর নীহারকণা বলে ওঠেন, 'তুমি সে সব কথার কিছু জিজ্ঞেস করনি? সত্যি কি মিথ্যে, কে এমন শত্রু আছে তার যে এতবড় ষড়যন্ত্র করেছে?'

'অফিসের মাঝখানে ওসব কথা? তা' ছাড়া কোনখানেই কি জিজ্ঞেস করতে পারতাম? না দিদি, সে সাধ্য আমার নেই। শুধু সহজভাবে বললাম, তোমার পিসিমা বড় ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন, অফিস মিটলেই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরো।' সঙ্গে সঙ্গে বললো, 'আমি আমাদের সংঘের ওখানেই এখন ক'দিন থাকবো বাবা। তারপর যা হয় একটা ব্যবস্থা করে নেব।' বললাম, 'তোমার পিসিমা বড্ড বেশি কাতর হবেন—' একটু হেসে বললো, 'আপনি তো আর হবেন না। শুধু পিসিমা। তাঁকে বলবেন আমি ভালই আছি।'

চন্দ্রনাথের গতকাল থেকে ভিজে হয়ে থাকা তুটি চোখের কোণ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। গোপন করবার আর চেষ্টা করেন না।

নীহারকণা হঠাৎ ধিক্কার দিয়ে ওঠেন, 'ছি ছি! এত নিষ্ঠুর! এতটুকু মমতা নেই?'

'আমরাও তো কম নিষ্ঠুর নই দিদি, আমরাও তো তাকে মমতা করিনি।'

'কী ব্যাপার ইন্দ্রদা? তুমি যে এখানেই আড্ডা গাড়লে? নতুন সুটকেস, নতুন জামাকাপড়।…কী হলো বল তো? বাড়ি থেকে পালিয়ে নয়তো?'

বাদল নামক ইন্দ্রর পরম অনুরক্ত কর্মী ছেলেটি প্রশ্ন করে ইন্দ্রকে হাসতে হাসতে।

ইন্দ্রও হেসে ওঠে, 'বৃথাই তোকে দোষ দিই বাদল বুদ্ধিহীন বলে। বেশ সহজেই ধরে ফেলেছিস তো!'

'ঠাট্টা রাখো ইন্দ্রদা, সত্যি বল ব্যাপারটা কী? কাল-পরশু কিছু ভাবিনি, মনে করেছিলাম খুব বড়গোছের কিছু একটা প্ল্যান্ করছো বোধহয়, নাওয়া খাওয়া ভুলতে হবে। তাই বাড়িতে মার খাবার ভয়ে দু'দিন এখানে এসে আড্ডা গেড়েছো।·· কিন্তু তোমার এই নতুন সুটকেস আর নতুন জামাকাপড় যে একটু ভাবনা ধরাচ্ছে।'

'ভাবনার কী আছে রে বাদল? চিরদিনই কি বাপের হোটেলে থাকবো? বড় হয়েছি, চাকরি-বাকরি করছি—'

'ছেঁদো কথা রাখো ইন্দ্রদা, নির্ঘাৎ একটা কিছু ঘটেছে। কিন্তু বাড়িতে মনোমালিন্য করে 'বাড়ি থেকে পালিয়ে?'—তুমি! উঁহু, হিসেব মিলছে না তো।'

'জগতের সব হিসেবই কি আর মেলে বাদল! ভেবেছিলাম মরুকগে যে যার খাতায় যে যার অঙ্ক নিয়ে থাকুক। চলে যাবেই যা হোক করে। কিন্তু তোকে নিয়েই মুশকিল। তুই আমার বারণ শুনবি, এ ভরসা নেই। নিশ্চয় ছুটে যাবি মিটমাট করাতে।…কেমন তাই তো?'

'নিশ্চয় তো! এই এখুনি চললাম।'

'যাবে বৈকি। আমার গার্জেন যে তুমি!'

'গার্জেন-টার্জেন বুঝিনা ইন্দ্রদা। এসব উল্টোপাল্টা ব্যাপার আমার ভাল লাগছে না।'

'তা' জগৎসংসারে সবই কি আর সোজা হবে? কিছু তো উল্টোপাল্টা হবেই রে।'

'তাই বলে তো আর নিশ্চিন্ত হয়ে ছেড়ে দেওয়া চলে না? সোজা করে নেবার চেষ্টা করতে হবে। আমি তো ভেবে পাচ্ছিনে তুমি হেন লোক বাড়ি থেকে ঝগড়া করে—'

'ঝগড়া করে!'

হো হো করে হেসে ওঠে ইন্দ্রনাথ,—'ঝগড়া কি বল?'

'আচ্ছা না হয় মনোমালিন্যই—'

'দূর পাগলা!'

'তা', কী তাই বলো?'

'কী তাই বলব?—বলতে তোকে পারি তবে বিশ্বাস-অবিশ্বাস তোর হাতে।'

নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণে সেদিনের ইতিহাসটুকু বিবৃত করলো ইন্দ্রনাথ বাদলের কাছে।

স্তম্ভিত বাদল সব শুনে প্রায় ধিক্কারের সুরে বলে—'বাঃ বাঃ চমৎকার। এই হলো আর অমনি তুমি সর্বত্যাগী হয়ে চলে এলে? প্রতিবাদ করলে না?'

'খুব বেশি না।'

'কেন খুব বেশি না? ধিক্কারে একেবারে 'ইয়ে' করে দিতে পারলে না? বলতে পারলে না একটা রাস্তার লোকের কথা এত বিশ্বাস হলো তোমাদের যে—'

'মুখে বলে লাভ কী?'

'ও, প্রতিবাদটা কাজে করেছ? এটা আবার বড্ড বেশি হয়ে

যাচ্ছে। কিন্তু ভাবছি—'

'তা' তোরই বা আমার সব কথা বিশ্বাস হচ্ছে কেন? কেন ভাবছিস না আমি বানিয়ে বানিয়ে নিরপরাধ সাজছি।'

'থামো ইন্দ্রদা।'

ইন্দ্রকে প্রায় ধমকে ওঠে বাদল,—'আমি ভাবছি কে তোমার এমন শত্রু আছে যে এই চক্রান্তটি করছে।'

'জানা তো নেই!' ইন্দ্র হেসে ওঠে, 'এ যাবৎ তো নিজেকে অজাতশত্রু ভেবে বেশ একটা আত্মগৌরবই ছিল।'

'ভুল, খুব ভুল। জগতে ভাল লোকদেরই শত্রু বেশি থাকে। কে জানে আমাদের এই সংঘের অনিষ্টসাধক কেউ আছে কি না, তোমার একটা দুর্নাম রটিয়ে যার ইষ্টসিদ্ধি হবে!'

'ত্রিজগতে এমন কোন নাম মনে আসছে না বাদল, আমার অনিষ্টে যার ইষ্টসিদ্ধি। এ স্রেফ্ টাকা আদায়ের কল। যত রাজ্যের রদ্দি ডিটেকটিভ গল্প পড়ে পড়ে দেশে এসব বিজাতীয় দুর্বুদ্ধির চাষ হচ্ছে।'

'মেনে নেওয়া শক্ত হচ্ছে। কাউকে ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের মানে বুঝি, কিন্তু এ কী?'

'এ আর একটা নতুন ফ্যাশান।'

হেসে ওঠে ইন্দ্রনাথ।

'হেসো না তুমি ইন্দ্রদা।'

'তা ছাড়া আর কী করবার আছে?'

'কিছু করবার নেই?…আশ্চর্য!…বদমাইশদের খুঁজে বার করতে হবে না?'

'খুঁজতে যাওয়া মানেই কতকগুলো কুশ্রী কথা আর কুশ্রী ঘটনার সম্মুখীন হওয়া!'

'তাই বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হবে?'

'থেকেই দেখা যাক না।'

হেসে ওঠে ইন্দ্র। 'সত্য যদি সত্যিই সূর্যের মত হয় তাহলে একদিন না একদিন মেঘমুক্ত হবেই।'

'আর তুমি সেই দিনের প্রত্যাশায় এই ভবঘুরে ভিখিরীর মতন হাটে বাজারে পড়ে থাকবে?'

'ক্ষতি কী? এও তো মন্দ লাগছে না। দেশে এমন অনেক ভদ্রলোক আছে বাদল, যারা এভাবে থাকতে পেলেও ধন্য হয়ে যায়।'

বাদল রেগে উঠে বলে, 'তুলনা করার কোনও মানে হয় না ইন্দ্রদা। দেশে এমন অনেক লোকও আছে যারা ফুটপাথের কোণে একটু জায়গা পেলেও ধন্য হয়ে যায়।—ও সব দার্শনিক কথা ছাড়ো। কথা হচ্ছে, অপরাধীর সন্ধান নিতে হবে।'

'হয়তো সন্ধান পাওয়া খুব একটা শক্ত নয়। হয়তো আরও আসতে পারে—গাছ নাড়া দিয়ে ফের ফুল কুড়োতে। এ রকম অপরাধীরা যদি না ধমক খায় তো বারে বারে আসে ভয় দেখাতে। পিসিমা কি আর তাদের মুখ বন্ধ করতে কিছু-না-কিছু না দেবেন?'

'যা-ই বলো ইন্দ্রদা, পিসিমার বিশ্বাস করাকে বলিহারী দিচ্ছি আমি।'

'মানুষ তো প্রতারিত হয়ই বাদল।'

'হোক্। তবু তার একটা মাত্রা থাকে।—কিন্তু ইন্দ্রদা, ওই ফটো না কী বললে, ওটা কিছুতেই বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে আমিও খুব পারিনি বাদল, যা শুনেছি তাই বললাম তোকে।'

'আমার মনে হচ্ছে ব্যাপারটা ইন্দ্রজাল।'

'হ্যাঁ তাই! আসলে কিছুই নয়, সাদা কাগজ। পিসিমাকে মেসমেরাইজ করেছে তারা।'

পাঁচদিন পরে আজ নিজস্ব স্বভাবে দরাজ গলায় হেসে ওঠে

ইন্দ্রনাথ। হেসে বলে, 'এই আর একবার শ্রীমান্ বাদলচন্দ্রের বুদ্ধির কাছে হার হলো আমার। বাস্তবিক এত সহজ কথাটা বুঝতে পারছিলাম না এতদিন!'

কিন্তু বাদল উপহাসে হার মানবার ছেলে নয়, ও সংকল্প করে, যে করেই হোক এ রহস্যের সূত্র আবিষ্কার করবেই।

'ইন্দ্রদা, আমি যাচ্ছি পিসিমার কাছে।'

'এই বাদল, ওইটি করতে যেও না।'

'কেন বলো! আমি কি কখনো পিসিমার কাছে যাই না?'

'সে তুমি পিসিমার হাতের চন্দরপুলি, গোকুল পিঠে খেতে যেতে পার, কিন্তু এখন যাওয়া চলবে না। পিসিমা যে ভেবে বসবেন সন্ধির দূত হিসেবে তোমায় পাঠিয়েছি আমি, সে হতে দেবো না।'

'আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ জানতে চাই।'

'লাভ কী? কোন এক পক্ষ প্রতারণা করেছে আর অপর এক পক্ষ প্রতারিত হয়েছে, মূল ঘটনা তো এই? এর থেকে কারো বা কিছু ধনহানি হয়েছে, কারো বা কিছুটা মানহানি হয়েছে—'

'কারো বা কোথাও প্রাণহানি হবে, দেখতে পাচ্ছি দিব্যচক্ষে।' বলে ওঠে বাদল।

'বাদল!'

রীতিমত বিরক্ত স্বরে বলে ইন্দ্রনাথ—'আমি আরও একটা জিনিস দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।'

'কী? কী দেখছ?'

'এই তোমার সঙ্গেও সম্পর্ক রহিত! এভাবে আমাকে বিরক্ত করলে, সব ছেড়ে ছুড়ে পালাবো।'

'বেশ ঠিক আছে, পিসিমার কাছে আমি যাবো না, কিন্তু এ চক্রান্তের সূত্র অন্বেষণ করতে পাবো না, তুমি এমন হুকুম যদি দাও,

তা'হলে জেনো আমার হাতেও শাস্তির অস্ত্র আছে।'

'উঃ বড্ড যে ভীতিপ্রদর্শন! তবে যা, জগতের যত গোয়েন্দাকুল আছে মনে মনে সকলের পদবন্দনা করে অভিযানে বেরিয়ে পড়! আসামীর আঙুলের ছাপ যদি নাও পাস, নিদেন হু'একগাছা ছেঁড়া চুল, অথবা—'

'আচ্ছা এখন ঠাট্টা করছ, পরে—'

'পুজো করবো কী বলিস!'

'আঃ ধ্যেৎ।'

'ছাখ বাদল, বাজে চিন্তা ছাড়। সংঘের আগামী অধিবেশনে—'

'রাখো ইন্দ্রদা তোমার আগামী অধিবেশন! আমার মাথায় এখন, —না থাক, এখুনি ফাঁস করবো না।'

বাদল চলে যায়।

ইন্দ্র ভাবে ওকে না বললেই বোধহয় ভাল হ'ত। কী না কী একটা ফ্যাচাং বাধাবে।

অপরাধীকে 'উচিত শাস্তি' দেবার উপযুক্ত প্রতিশোধ-স্পৃহা আপাতত নেই, কেমন একটা নির্বেদ ভাব এসে গেছে।

মাইনের মত মাইনে নয়। বলতে লজ্জা ভাবতে লজ্জা। তবু মাইনেটা পেলেই কমলির জন্যে কিছু-না কিছু কেনে ননী। হয় সাবান নয় পাউডার, নয় তো বা দু'গজ ফিতে, কি চারটি মাথার কাঁটা। নেহাৎই তুচ্ছ বস্তু, তবু সেই তুচ্ছটুকুই দাতার হৃদয়-ঐশ্বর্যে পরম মূল্যবান হয়ে ওঠে।

আজ ননীর সেই মাইনের দিন।

পরম লজ্জা আর পরম সুখের দিন!

সকাল থেকে কল্পনার পটে এঁকে চলেছে এক টুকরো সুখের ছবি।

এবার একটা বড় রকমের খরচা করে ফেলেছে ননী, কিনেছে একটা ছিটের ব্লাউস আর এক শিশি জবাকুসুম।

কথায় কথায় কমলা একদিন বলেছিল, বেজায় চুল উঠে যাচ্ছে কেন বল তো ননীদা? কী করা যায়?

তখন ননী ঠাট্টা করে বলেছিল, ভাবনা চিন্তাগুলো একটু কমা কমলি, অষ্ট-প্রহর আকাশপাতাল ভেবে ভেবেই তোর মাথার চুল সব ঝরে যাচ্ছে।

কিন্তু মনে মনে সংকল্প করেছিল একটা সত্যিকার ভাল গন্ধতেল নিয়ে আসবে কমলার জন্যে।

আর ওই ছিটের ব্লাউসটা!

ওটা ফুটপাতের ধারে পার্কের রেলিঙের গায়ে নিজের সৌন্দর্য বিস্তার করে ঝুলছিল, সে সৌন্দর্যে ননীর প্রাণ মোহিত হয়ে উঠলো, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে কিনে ফেললো জামাটা নগদ দু'টাকা বারো আনা দিয়ে।

এই খরচার জন্যে ননীকে অবশ্যই নিজের 'অবশ্য প্রয়োজনীয়'

থেকেও কিছুটা বঞ্চিত হতে হবে, তা' হোক, তবু আজ ননী যেন হাওয়ায় ভাসছে।

কেনার পর বাড়ি এসে কাগজের প্যাকেটটা খুলে বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিল, আন্দাজ করতে চেষ্টা করলো গায়ে ঠিক হবে কি না কমলির, তারপর নিশ্চিত হলো নিশ্চয়ই হবে। কমলির সম্পর্কে ননীর আন্দাজ কি ভুল হতে পারে?

হাতের জিনিসটা খপ্ করে পিছনে চালান করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেও কেষ্টমোহিনীর চোখকে ফাঁকি দিতে পারলো না ননী।

কেষ্টমোহিনী হাঁক দিয়ে উঠলো, 'হাতে কী রে ননী?'

'কিছু না তো মাসি।'

ননী দরাজ গলায় বলে।

'অমন ডাহা মিথ্যে কথা বলিসনে ননী, মুখে পোকা পড়বে। কমলির জন্যে কিছু এনেছিস বুঝি?…খাবার দাবার?'

'না না, খাবার-দাবার আবার কি। ইয়ে—একটা চুলে মাখবার তেল। দুঃখু করছিল সেদিন, 'চুলগুলো সব শেষ হয়ে গেল ননীদা—'

'হুঁ, দুঃখু জানাবার জন্যে যখন এমন সোহাগের ননীদা রয়েছে, আর জানালেই তার প্রতিকারের আশা রয়েছে তখন জানাবে বৈকি! কিন্তু তোর মতন এমন নেমকহারাম দেখলাম না রে ননী। বলি আমার এই মুখখানা যে মেচেতা পড়ে পড়ে একেবারে কালো অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, তা তো কোনদিন তাকিয়ে দেখিস না? বলিস না তো যে মাসি এই ওষুধটা মেখে দেখ! হুঁঃ! মেচেতা…বলে বাতের ব্যথায় উঠতে নড়তে বাপকে ডাকি, তাই একটু ওষুধ জোটে না…'

ননী এবার ব্যাজার মুখে বলে, 'তা তুমি যদি সব পয়সা জমাও। নইলে—'

'খবরদার ননী! জমানোর খোঁটা দিসনে। পয়সা আমি জমাই?

জমাতে পাই ?—দু' দুটো মানুষের খরচ নেই ?'

ননী প্রমাদ গুণে বলে, 'আহা তা কি আর আমার জানা নেই মাসি! বিশেষ এই বাজারে। ও তোমায় ঠাট্টা করলাম একটু।'

'ঠাট্টা! পোড়াকপাল আমার! ঠাট্টা করবার আর সুবাদ পেলে না তুমি। কিন্তু ও বস্তু নিয়ে এগোচ্ছো কোথায় ? কমলি ঘরে নেই।'

'ঘরে নেই! কোথায় গেছে ?···টিউবওয়েলে ?'

'তুই আর বকিসনে ননী! রাজনন্দিনী আবার কবে টিপকলে যান! সব জল বইবার ভার তো এই বুড়ির।—তিনি গিয়েছেন বেড়াতে।'

'বেড়াতে! একলা!'

'হ্যাঁ। ক্রেমশ ডানা গজাবে তো! তোকে এই বলে দিলাম ননী, এরপর দেখে নিস, ও তোরও থাকবে না, আমারও থাকবে না। পাখা মেলে উড়বে। বলে কি না কে কোথায় বিনি মাইনেয় সেলাই-ইস্কুল খুলেছে, তাইতে ভর্তি হবে!'

'সেলাইয়ের ইস্কুল!'

'হ্যাঁ রে হ্যাঁ। সেলাই শিখে দর্জি হবে। দর্জিগিরি করে পেট চালাবে। সেই সেদিনের সেখেনে আর একবার নিয়ে যাবার জন্য ঝুলোঝুলি করছি! পিসি মাগী তো বলেছিল, আপাতত মাসে মাসে কিছু কিছু করে দেবে—তা রাজনন্দিনী কিছুতে রাজী হলেন না। এখন নতুন করে ওঁর নাকি লজ্জা করে, ভয় করে! 'কাল' করেছিস ননী ওই ছবি তুলে! চব্বিশ ঘণ্টা ঘরের কোণে বসে ওই ছবি নিয়ে দেখছে নাড়ছে, তুলছে রাখছে। যেন সত্যি-বিয়ের বরের! মুখ কালি করে আর কী হবে বাছা! শাস্তরেই আছে—কাগের বাসায় কোকিল থাকে যতদিন না উড়তে শেখে, উড়তে শিখে ধর্ম রেখে চলে যায় সে অন্যবন।···তোর আর কী! আমারই সর্বনাশ। তিন তিনশো টাকা দিয়ে কিনেছিলাম, এতদিন খাওয়ালাম পরালাম, সব জলে যেতে

বসেছে গা! সৎপথে থেকে উনি দু'দুটো মানুষের পেট চালাবেন! হুঁঃ! পিরথিবীটা তেমনি সৎ যে।'

ননীর আর উত্তর দেবার ক্ষমতা নেই।

ননীর বুকে শক্তিশেল পড়েছে।

বিনি মাইনের সেলাই-স্কুল কে খুলেছে, সে কথা কেষ্টমোহিনী না জানলেও ননী তো ভালই জানে।

মুখ নিচু করে দাঁড়িয়েছিল কমলা।

চোখ তুলে তাকাবার সাধ্য নেই। পা কাঁপছে, হাত কাঁপছে, কাঁপছে বুক।

শিক্ষয়িত্রী অনিমা পাল জনান্তিকে বলেন, 'এই আর একটি নতুন মেয়ে ভর্তি হতে এসেছে ইন্দ্রবাবু। এখন কী করি বলুন? সিট তো আর নেই।'

ইন্দ্রনাথ নতুন মেয়ের প্রতি একবার তাকিয়ে বিব্রত ভাবে বলে, 'একেবারে নেই?'

'কোথা থেকে থাকবে বলুন? একেই তো এমন যুগ পড়েছে, মেয়ে-পুরুষ ইতরভদ্র সবাই কোন একটা কিছু শেখবার জন্যে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে, মাইনে নেওয়া স্কুলেরাই দেশের চাহিদা মেটাতে পারছে না, তার ওপর আবার আপনার এই উইদাউট ফী—। দলে দলে মেয়ে আসছে, ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে। কিন্তু এ মেয়েটি একেবারে নাছোড়।'

ইন্দ্রনাথ একবার অদূরবর্তিনীর দিকে তাকিয়ে নিয়ে মিনতির সুরে বলে, '—এত যখন ইচ্ছে, কোনমতে নিয়ে নিতে পারবেন না মিসেস পাল?'

মিসেস পাল নিতান্ত বেজার হন।

মেয়েটি সম্বন্ধে তিনি কিঞ্চিৎ সন্দেহযুক্ত।

ঠিক ভদ্রঘরের মেয়ে কি? থাকে তো কলোনিতে। সে কলোনিরও সুনাম নেই। তা ছাড়া জায়গা তো সত্যিই নেই, প্রায় প্রতিদিনই দু'পাঁচজনকে নিরাশ করতে হচ্ছে। আর, এ যেন ছিনেজোঁক। কেবল একঘেয়ে কথা, 'দয়া করে যদি—'। আরে বাবা, দয়া যদি করতেই হয়, তুই ছাড়া কি আর উপযুক্ত পাত্র নেই?

কিন্তু মনের কথা মনে থাক।

অনিমা পাল বেজার মুখে বলেন, 'কী করে নিই বলুন ? একে তো ঘর ছোট, তাছাড়া মেশিন কই ? তিনটে শিফ্‌টে কুলিয়ে উঠতে পারছি না।'

'আচ্ছা, আর একটা মেশিনের ব্যবস্থা আমরা করবো মিসেস পাল, শীগগিরই করবো, কিন্তু ঘরের ব্যবস্থা তো চট করে করা সম্ভব নয়। এখন ওর মধ্যেই যা হয় করে যদি এই আর একটা সিট—'

মিসেস পাল মনে মনে জ্বলে যান।

সুন্দর মুখ দেখে যেন একটু বেশি গলছেন সেক্রেটারি সাহেব। কিন্তু অনেক মেয়েকে ফেরাচ্ছেন মিসেস পাল, সে মনের জোর তাঁর আছে। কাজেই দৃঢ়স্বরে বলেন, '—হতে পারে না ইন্দ্রনাথবাবু! আপনার এই তাঁতঘরখানার মত বড় ঘর যদি আমি পেতাম, অনায়াসে আরো দু'গুণ মেয়ে নিতে পারতাম। এঁদের মধ্যেই কেউ কেউ প্রথম স্টেজদের শেখাতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু জায়গা কোথা ? আপনাদের যে আবার কঠিন জেদ গভর্নমেণ্ট এড্‌ নেবেন না। যতটা কাজ হচ্ছে এখানে, সেটাই একটু গুছিয়ে-গাছিয়ে দেখাতে পারলে সরকার থেকে মোটা টাকা সাহায্য পাওয়া যেত !'

ইন্দ্রনাথ একটু হাসে।

'কাজের পরিমাণটা একটু গুছিয়ে-গাছিয়ে দেখিয়ে সরকার থেকে মোটা টাকা আদায় তো চিরকালই আছে মিসেস পাল, হাজারো প্রতিষ্ঠান তা' করছেও ! একটা প্রতিষ্ঠান না হয় তা' থেকে একটু পৃথক থাকলো। সরকার তো নিজের ঘর থেকে দেন না। দেন জনসাধারণের কাছ থেকেই কুড়িয়ে। জনসাধারণ না হয় সরাসরিই দিল।'

'তা' দিলে তো আর ভাবনা ছিল না। দেয় কই ?' মিসেস পাল আরও বেজার মুখে বলেন, 'মানুষ মানুষের মত আচরণ করলে তো আইন গড়বার দরকারই হতো না। করে না বলেই আইনের প্যাঁচ কসে করিয়ে নেওয়া।

মেয়েটি চঞ্চলভাবে বারবার চোখ তুলে মিনতি জানাচ্ছে। ইন্দ্রনাথ শেষ চেষ্টা করে, 'তাহলে কিছুতেই সম্ভব নয় ?

'আপনি যখন বিশেষ করে বলছেন তখন সম্ভব করিয়ে নিতেই হবে।'

মিসেস পালের 'বিশেষ' শব্দটির উপর জোর দেওয়া কান এড়ায় না ইন্দ্রনাথের। একটু দ্বিধায় পড়ে যায়। আগে হলে পড়তো না —এখন পড়লো। এখন বুঝছে সমাজের কাজ করে বেড়াতে হলে মিথ্যে দুর্নামকেও একেবারে অগ্রাহ্য করা চলে না। তাই অগত্যাই বলে,—'তবে থাক। বুঝতে পারছি আপনি খুব অসুবিধেয় পড়েছেন। আচ্ছা, আমাদের উত্তর কলকাতার কেন্দ্রে যদি—ইয়ে শুনুন, কোথায় থাকেন আপনি ? উত্তর কলকাতায় আমাদের একটা কেন্দ্র আছে, সেখানে চেষ্টা করলে হয়তো—'

'আমি এখানেই থাকি। ওই নতুন ইস্কুলটার পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা সাঁকোর দিকে গেছে, সেই রাস্তায়।'

'তাইতো, তাহলে তো খুব সুবিধে হবে বলে মনে হচ্ছে না। যাতায়াতের খরচাতেই তো—'

'তবে'—মেয়েটি ব্যগ্রভাবে বলে, 'যেখানে হোক, যে করে হোক আমার একটা ব্যবস্থা করে দিন। সেলাই হোক যা হোক।···নইলে আমার যে কী হবে !'

'তাঁত চালাতে শিখবেন ?' একটু হাসে ইন্দ্রনাথ।

'আপনি যা বলবেন তাই করবো। একটা কিছু করে নিজে দাঁড়াতে চাই আমি।'

'আমরাও তো তাই চাই', হাসে ইন্দ্র,—'কী বলেন মিসেস পাল ?'

মিসেস পাল আর কিছু বলেন না।

ইন্দ্রনাথই ফের বলে, 'ঠিক আছে, তাহলে আমাদের একটি কর্মী

ছেলেকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনাকে তাঁতঘরে নিয়ে গিয়ে সব বুঝিয়ে দিয়ে ভর্তি করে নেবে। কেমন?'

নীরবে ঘাড় কাৎ করে মেয়েটি।

'আচ্ছা, কিন্তু এদিকে তো সন্ধ্যে হয়ে আসছে—দেরি করলে তাঁতঘর বন্ধ হয়ে যাবে। এক কাজ করুন, আমার সঙ্গেই চলুন। আমি ওখানে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে বলে-কয়ে চলে যাবো। সপ্তাহে তিনদিন ক্লাস। খুব ইন্টারেস্টিং, একটু মন দিয়ে শিখতে চেষ্টা করলে দেখবেন খুব ভাল লাগবে। চলুন তবে চটপট!'

ইন্দ্রনাথ এগোতে থাকে।

পিছন পিছন মেয়েটি।

মিসেস পাল অস্ফুট মন্তব্য করেন, 'আমি বুঝেই ছিলাম।'

তাঁতঘর সেই সাঁকোর ওপারে।

যেদিকে সূর্য ঢলছে।

চারিদিক সোনায় সোনা। গাছের মাথায় মাথায় সোনা রোদ, মাটির বুকে বুকে সোনালি আলো, পশ্চিমমুখী পথ ধরে এগিয়ে যাওয়া মানুষ দুটোর মুখে সোনারঙা আবীর।

আগে পিছের বাধা দূর হয়ে ক্রমশ কখন পাশাপাশি হয়ে পড়েছে দু'জনে।

নীরবতা অস্বস্তিকর।

ইন্দ্রনাথ কথা বলছে।

'বাড়িতে আপনার কে কে আছেন?'

'মাসিমা।'

'মাত্র? আর কেউ না?'

'আর কেউ না।'

'এদিকে কতদূর এগিয়েছিলেন? মানে আর কি, স্কুলে?'

'সামান্যই। মাসিমার অবস্থা ভাল নয়।'

'আমাদের দেশে ক'জনেরই বা অবস্থা ভাল মিসেস—মিস—'

'আমার নাম কমলা।'

'ওঃ আচ্ছা। এখানকার ছাত্রীদের অনেককেই আমি নাম ধরে বলি।'

'আমাকেও বলবেন!'

চোখ তুলে কথাটা বলে বুঝি চোখ নামাতে ভুলে যায় কমলা।··· এই সেই মুখ।···যে মুখ প্রতিনিয়ত কী এক দুর্বার আকর্ষণে কমলাকে কেন্দ্রচ্যুত করতে চাইছে। দিনে দিনে ভেঙেচুরে গড়ছে কমলাকে··· পুরনো কমলা ক্রমশই পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে!

কী সুন্দর! কী অপূর্ব!

ইন্দ্রনাথও একটু অবাক হয়েছে বৈকি!

এতক্ষণ মেয়েটার মুখ এত নিচু ছিল যে ভাল করে দেখতেই পাওয়া যাচ্ছিল না, এখন দেখে অবাক হলো।

দু'পাশে দুটি ঝোলানো বেণী, কপালের উপর চুলের থাক, দীর্ঘ পল্লবে ঘেরা চোখ দুটি কী বড় বড় আর কোমল কালো! আর সেই চুলের পটভূমির উপর ওই চোখের ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যান্বিত সমস্ত মুখটা একেবারে নিখুঁত সুন্দর!

অবশ্য এই রূপ দেখেই যে অবাক হলো ইন্দ্রনাথ তা নয়, অবাক হলো এই ভেবে যে, এমন মেয়ের বিয়ে হয়ে ওঠেনি কেন? নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্যে এর এত আকুলতা কেন? তবে কি বিধবা?

এমন সুকুমারমুখী কিশোরী কি বিধবা হওয়া সম্ভব?

হ্যাঁ, কিশোরীই মনে হয় কমলাকে।

ওর মুখশ্রীর জন্যেই মনে হয়, মনে হয় ওর সুগঠিত দেহের জন্যে। অমন সুকুমার মুখ, আর অমন বিশাল ঢলঢল চোখ বলেই না অমন করে লোকের মনে বিশ্বাস জন্মাতে পারে কমলা! ওই চোখের

আয়ত বিষণ্ণ দৃষ্টি, আর মুক্তাবিন্দুর মত অশ্রু !

এতে আবার মানুষ বিভ্রান্ত না হয়ে পারে !

কিন্তু এখন এ চোখে আর কিছু নেই, আছে শুধু মুগ্ধ বিনম্র চিত্তের পূজা।

কৃতজ্ঞ দৃষ্টি ঢের দেখেছে ইন্দ্রনাথ, তবু যেন কেমন চাঞ্চল্য জাগে।

তাড়াতাড়ি চলার গতি দ্রুত করে ফেলে বলে, 'একটু শীগগির চলুন, স্কুল বন্ধ হয়ে গেলে মুশকিল।'

ননী এসে আগের মত চৌকির ওপর বসে পড়ল না, বসল প্যাকিং কাঠের টেবিলটার ওপর। আজ আর তার শ্যামল মুখে আলোর উপস্থিতি নেই। কালো শুকনো শীর্ণ মুখ, চোখছুটো যেন দপদপ করছে। মুখের রেখায় রেখায় ঈর্ষা আর হতাশা, ক্লান্তি আর রুক্ষতার ছাপ।

এখন আর আগের মতন উৎফুল্ল আনন্দে হাসতে হাসতে ঢোকে না ননী, এবং সহজ আনন্দে সে আবির্ভাবকে বরণ করতে পারে না কমলা।

কমলা যেন লজ্জায় আড়ষ্ট, ননী বিস্ময়ে কঠিন।

কমলার চোখ যেন নিরুপায় লজ্জায় ম্লান হয়ে বলতে চায়,—কী করবো ননীদা, আমি যে পারছি না। ভেসে যাচ্ছি।

ননীর দপদপে চোখছুটো যেন নীরব তিরস্কারে ধিক্কার দেয়,—ছি ছি, তুই এই?

মুখে কিন্তু আর তেমন সহজে 'তুই' বলতে পারে না ননী। ঈর্ষার মত কেমন একটা সূক্ষ্ম জ্বালা-ধরা-মনে কেন কে জানে কেবলই ভাবতে থাকে ননী, কমলা তার থেকে অনেকটা উঁচুতে উঠে গেছে। ননীর থেকে, মাসির থেকে, তার সমস্ত পরিবেশের থেকে।

আর কমলা?

সজ্ঞানে কিছুতেই যদি স্বীকার করতে না চায়, তবু অবচেতন মনে কমলাই কি ননীকে তার চাইতে অনেকটা নিচু স্তরের জীব বলে মনে করতে শুরু করেনি?

তাই ননী এসে ঘরে ঢুকে দূরে বসে।

কমলা অকারণে একখানা পড়া বইয়ের পাতা ওল্টায়।

বই পড়া কমলার নতুন নয়, যা বিদ্যে অর্জন করবার সুযোগ

পেয়েছিল ছেলেবেলায়, তাকেই চেষ্টা করে বাড়িয়ে বই সে পড়ে ফেলেছে বিস্তর। মাঝে একবার কিছুদিনের জন্য যখন ননীর কী যেন একটু ভাল চাকরি হয়েছিল, কমলাকে তো একটা লাইব্রেরিতেই ভরতি করে দিয়েছিল। তারপর অবিশ্যি সে চাকরিও ঘুচল, লাইব্রেরিও ঘুচল। কিন্তু যেমন করে হোক বই কমলা পড়েই। উঁচুদরের সাহিত্য না হলেও সিনেমা-পত্রিকা, বাজার-চলতি সাহিত্য।

ননী জানে। তবু আজ ব্যঙ্গ করে বলে ওঠে, 'পড়ো পড়ো। পড়ে পড়ে বিত্নষী হও। লেক্‌চারবাবুর উপযুক্ত তো হতে হবে!'

'ছিঃ ননীদা!' কমলা আরক্ত মুখে বলে, 'তুমি আজকাল যেন যা তা হয়ে যাচ্ছ। কেবল এইসব বিচ্ছিরি কথা। শিখছি একটা কাজ ভালর জন্যেই তো? তা' সেখানে তার সেক্রেটারি যাওয়া-আসা করবে না?'

'করবে বৈকি, একশোবার করবে। আগে যেখানে মাসে তিন বার যেত, এখন সেখানে হপ্তায় তিনবার যাচ্ছে।'

কমলার মুখটা লাল হয়ে ওঠে।

কে জানে লজ্জায় না গর্বে।

তবে কথাতে কিছুই প্রকাশ পায় না। সহজভাবে বলে, 'আগে মাসে মাত্র তিন বার যেতেন, এ খবর কে দিয়েছে তোমায়?'

'খবর কাউকে কাছে এসে দিয়ে যেতে হয় না কমলা, খবর কানে হাঁটে। যাক্ ভালই তো! এ তো সুখবর! সুলক্ষণযুক্ত সময়ে দু'জনের ফটো জুড়ে দিয়েছিলাম, এবার প্রজাপতি ঠাকুর সত্যি দু'জনকে জুড়ে দেবেন।'

'আঃ ননীদা! ফের ওই পচা ঠাট্টা।'

'ঠাট্টা নয় সে তুমি নিজেই ভাল জানো কমলা। চারিদিকেই একথা রাষ্ট্র হয়ে গেছে। শুনছি নাকি, ইন্দ্রবাবু এখন বাড়ি থেকে আউট হয়ে এসে কোন বন্ধুর ফ্ল্যাটে বাস করছে।'

'সে তো শুনি কাজের সুবিধের জন্যে।'

'তা' তো শুনবেই! শোনা কথা শুনতে ভালই হয়।'

কিন্তু, মনের জ্বালায় ফের 'তুই' সম্বোধনে ফিরে আসে ননী, 'বলিহারি' যাই তোকে কমলি, জোচ্চুরি করে যা বলে এলি, শেষ অবধি তাই করলি? ওর গলায় পরাবার জন্যেই মালা গাঁথতে বসলি?'

'আচ্ছা ননীদা, তুমি কিগো? যা মুখে আসে তাই বলবে? তিনি কী, আর আমি কি,এ জ্ঞান কি তুমি হারিয়ে ফেলেছ?'

'জ্ঞান আমি হারিয়ে ফেলিনি কমলি, যে হারাবার সে হারিয়েছে। ওসব বড়লোকরা সুন্দরী মেয়ে দেখলেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।'

কমলা গম্ভীরভাবে বলে, 'যা প্রাণ চায় বলো। আমি কিছু বলব না।'

'বলবার কিছু থাকলে তো বলবি? কিন্তু ভাবছি কমলি, তোরা মেয়েমানুষ—সব পারিস? অতবড় রুইটাকে কেমন গেঁথে তুললি।'

'আঃ ননীদা! দোহাই তোমার! ওঁর সম্বন্ধে এ সব বিচ্ছিরি কথা বোলো না! উনি দয়ালু, সবাইকেই দয়া করেন। আমাকেও—'

'দয়ালু! হুঁঃ!'

'দয়া করে সবাইকেই তাঁতঘর থেকে তাদের আপন আপন ঘরে সঙ্গে করে পৌঁছে দিয়ে যান, কেমন?···সবাইয়ের জন্যেই তাঁতের মাকুর মতন সকল জায়গা থেকে ছুটে ছুটে তাঁতঘরে টানাপোড়েন করেন, কেমন? ···দয়া! আমাকে তুই আর হাইকোর্ট দেখাতে আসিসনি কমলি!'

হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে ওঠে কমলা।

জ্বলে উঠে জ্বলন্ত স্বরে বলে,—'তুমিও আর আমাকে উত্যক্ত করতে এসো না ননীদা। আমাকে নিজের মনে থাকতে দাও।'

'ওঃ! বুঝেছি!

ননী তার সেই রাজাসন থেকে ঝট করে উঠে দাঁড়ায়। মনে হলো মুখখানায় তার কে যেন আলকাতরা মাখিয়ে দিয়েছে। দুঃখে অপমানে ক্ষোভে বিকৃত সেই কালিপড়া মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে ননী বলে, '—বুঝেছি। তা, এটুকু মুখ ফুটে বলতে বুঝি এতদিন চক্ষুলজ্জায় বাঁধছিল? বেশ চললাম।···নিষ্কণ্টক হও তুমি। তোমাদের ভগবান তোমায় সুখশান্তি দিন।···কিন্তু মনে রেখো কমলা, যে পথে পা বাড়িয়েছ সে হচ্ছে চোরাবালি।'

হঠাৎ ছুটে বেরিয়ে যায় ননী!

গরিব ননী, নিঃসহায় নিঃসঙ্গ ননী! জীবনযুদ্ধে পরাজিত বেচারা ননী!

ননী ছুটে বেরিয়ে গেল, কিন্তু কই, কমলা তো ছুটে বেরিয়ে আটকাতে গেল না তাকে?

নাঃ, কমলার আর সে 'এনার্জি' নেই।

ননীর অবস্থা দেখে তার দুঃখ হচ্ছে, মমতা হচ্ছে, বুঝি বা করুণাও হচ্ছে, কিন্তু তার জন্যে কিছু করবার উৎসাহ খুঁজে পাচ্ছে না কমলা।

উৎসাহ কমলা কিছুতেই পাচ্ছে না। তাই বসে বসে ননীর ওপর রাগ আনতে চেষ্টা করে। আচ্ছা কেন? কেন ননী এভাবে অপমান করবে কমলাকে? শুধু কমলাকেই নয়, সেই দেবতুল্য মানুষটাকেও!

ছি—ছি—ছি!

যেদিন থেকে তাঁদের স্কুলে ভরতি হয়েছে কমলা, সেইদিন থেকেই মুখ ভার ননীর। তারপর ক্রমশই মনের কালি ছড়াচ্ছে। ছুতোয়-নাতায় ছুঁচ ফোটাচ্ছে কমলাকে, আজ তো একেবারে চরম হয়ে গেল!

সন্দেহের কীট কুরে কুরে খাচ্ছে ওকে।

অথচ সমস্তই অমূলক।

সমস্তই হাস্যকর ধৃষ্টতা।

সংঘ-সেক্রেটারি ইন্দ্রনাথ চৌধুরী, রাজপুত্রের মত যার রূপ, রাজপ্রাসাদের মত যার বাড়ি, চারটে ছ'টা পাস করে একটা অফিসের 'সাহেব' হয়ে বসেছে যে লোক, তার কাছে কি না কমলা ?

কী ধৃষ্টতা !

কমলাকে তিনি পৌঁছে দিয়ে যান সত্যি, কিন্তু সে তো দয়া করে। কমলা কমবয়সী বলেই। ওই তাঁতঘরে কমলার মতন মেয়ে আর ক'টা আছে ? একটাও তো না। সবাই বড় বড়। সবাই প্রায় কালো কুশ্রী।

তবে ?

এটুকু যদি তিনি করে থাকেন কমলার জন্যে, সে তাঁর দয়ালু স্বভাব বলেই।

সূর্যের আলো পথের ধুলোর ওপরও পড়ে, কিন্তু পথের ধুলো কি সূর্যের কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারে ?

কমলা ধুলো, একেবারে পথের ধুলো !

তবু কমলাকে তিনি 'আপনি' বলে কথা ক'ন ! কী অসহ্য সুখ !

সে যেন আর কেউ।...আর কোনো কমলা, অথবা সেইটাই সত্যিকার কমলা। আর এই নীচ সংসর্গে পালিত, এই হীন পরিবেশে পড়ে থাকা, এই চোর জোচ্চোর ধাপ্পাবাজ কমলা সেই কমলার একটা ছাউনি ?...উপরকার খোলস একখানা !

তাই ! তাই !

এই খোলসখানা ভেঙে সত্যিকার কমলা উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে তখন, যখন তার উপর সূর্যের কিরণ এসে পড়ে।

ননীদা এই ফুটে ওঠার মর্ম কি বুঝবে ?

ওদের মগজে একটা মাত্র কথাই ঢোকে, সেটা হচ্ছে বিয়ে।

বিয়ে !

এমন অসম্ভব সৃষ্টিছাড়া কথা মাথাতেও আসে ননীদার !

কিন্তু !

হঠাৎ নিজের মধ্যেই নিজে স্তব্ধ হয়ে যায় কমলা। বিয়েটা তা'হলে কাকে ?

ননীদাকে !

পাল্লাটা যে একেবারে হাল্‌কা হয়ে ঠক্‌ করে উঠে পড়ছে।

কিন্তু শুধু তো একা ননীই নয়, সংঘের অনেক সভ্য-সভ্যারই নজর লেগেছে কমলার এই সামান্য সম্পদটুকুর ওপর।

ইন্দ্রনাথের আড়ালে হাসাহাসি করছে ওরা, সংঘের এবার বারোটা বাজলো হে ! ইন্দ্রনাথবাবুই যখন—

যাই বলো, ইন্দ্রদা'র পক্ষে এটা যেন ভাবাই যায় না।

বুঝলাম না হয় দেখতে শুনতে একটু পরিষ্কার, কিন্তু পরিষ্কার মুখ কি এর আগে কখনো দেখেননি ইন্দ্রদা ? কত কত রূপবতী যে তাঁর জন্যে তপস্যা করছে !

বাবা ! ভীষ্ম হওয়া অত সহজ নয় ! মনে হতো কতই বুঝি একেবারে ইয়ে—যেই একটি সুন্দরী তরুণী দেখলেন, ব্যাস্‌ !

প্রায়ই চলছে এ রকম আলোচনা।

কিন্তু ইন্দ্রনাথ কি খুব একটা কিছু অশোভন আচরণ করছে ? না, সেকথা বললে তাকে অন্যায় দোষ দেওয়া হয়। সে সব কিছুই না।

শুধু কমলাকে দেখলেই ওর মুখটা কেমন একটু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কমলার সঙ্গে দেখা হবার ইচ্ছেয় অন্য সব কাজ তাড়াতাড়ি সেরে নিতে ইচ্ছে করে, কমলার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর সময়ের জ্ঞানটা যেন একটু কমে যায়।

আর—কমলাকে তাদের সমস্ত কেন্দ্রের সমস্ত কাজকর্ম দেখিয়ে বেড়ানোটা একটা কর্তব্যের মধ্যে গণ্য করে ইন্দ্রনাথ।

আজও সেই কথাই হচ্ছিল।

'মধ্য কলকাতায় আমরা আর একটা প্রাথমিক স্কুল খুলেছি, চলুন না দেখে আসবেন।'

'মধ্য কলকাতা! কোথায়! মানে কোন্ রাস্তায়?'

বিহ্বলভাবে বলে কমলা। কমলা কি জানে কাকে বলে মধ্য কলকাতা, আর কাকে বলে উত্তর।

'মির্জাপুর স্ট্রীটের একটু ওদিকে। আশপাশে অনেক বস্তি রয়েছে—কত যে দুঃস্থ ছেলেমেয়ে তার সংখ্যা নেই। অবিশ্যি কিছুই হয় না, বুঝলেন, কিছুই হয় না',—আবেগভরা কণ্ঠে বলে ইন্দ্রনাথ। 'একটা কেন এক হাজারটা প্রাথমিক স্কুল খুললেও এদেশের নিরক্ষরতা দূর হবে না, তবু চেষ্টা তো করতে হবে। কী বলেন?'

'কী বলেন!' কমলাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে 'কী বলেন? কী অভিমত তার!'

কমলার দীর্ঘ সুঠাম ঋজু দেহখানা বাতাসে বেতপাতার মত কাঁপতে থাকে।

'কই কথা বলছেন না যে?'

'আমি কী বলবো?' অতি কষ্টে বলে কমলা।

'আপনারাই তো বলবেন! কেবলমাত্র সুবিধের অভাবে উপযুক্ত শিক্ষার্জন করতে না পারার দুঃখ তো আপনারাই মর্মে মর্মে বোঝেন। দেখছি তো আপনাকে! কত বুদ্ধি, কত চেষ্টা, কি রকম অনলস পরিশ্রমী,—সুযোগ পেলে আপনি লেখাপড়ায় কত উন্নতি করতে পারতেন। হয়তো খুব ভাল একটি অধ্যাপিকা হতে পারতেন আপনি!'

'হয়তো পারতাম! কিন্তু সে তো আর এ জন্মে হলো না।'

কমলা হঠাৎ সকৌতুকে হেসে ওঠে।

'তার বদলে না হয় একটি ভাল তাঁতিনীই হবো।'

এ হাসি আচমকা।

ইন্দ্রনাথের এই অগাধ আশার স্বপ্নবার্তা শুনে বুকের ভিতর থেকে নির্মল কৌতুকের হাসি উথলে উঠেছে কমলার।

সেই কমলা! খারাপ মেয়েদের কাছ থেকে বাচ্চা ছেলে ভাড়া করে এনে লোককে মিথ্যে দুর্নামের ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে টাকা আদায় করে পেট চালায় যে কমলা!

না, সেই থেকে অবিশ্যি আর কোনদিন সে-কাজ করেনি কমলা, কিছুতেই রাজী হয়নি করতে, কিন্তু এই সেদিনও তো করে এসেছে! তার সামনের এই জ্যোতির্ময় পুরুষটির নামেই তো কালি মাখিয়ে এসেছে সেদিন! উঃ, ভাগ্যিস্ ইনি সেদিন বাড়ি ছিলেন না।

থাকলে তো কেষ্টমোহিনীর নির্দেশ আর ননীদার পদ্ধতি অনুযায়ী এঁর মুখের উপরই বলতে হতো,...'এত নিষ্ঠুরই কি হতে হয়?' বলতে হতো...'আমাকে দেখো না দেখো, এই দুধের শিশুটার মুখপানে চাও!' বলতে হতো,...'তা, এখন তো চিনতে পারবেই না। কিন্তু ধর্ম আছেন, ঠাকুর আছেন। এই বাচ্চার দিকে তাকিয়ে...'

তারপর আর কথা শেষ করতে হতো না, শুধু কাঁদলেই চলতো।

আজ মনে হচ্ছে ঠাকুর আছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠাকুর আছেন।

তাই সেদিন ইন্দ্রনাথের বাড়িতে গিয়ে ইন্দ্রনাথের মুখোমুখি পড়তে হয়নি। পড়লে, কোথায় থাকতো এই স্বর্গ!

হাসি শুনে ইন্দ্র যেন চমকে উঠল।

এ মেয়ে এমন করে হাসতেও জানে?

এযাবৎ শুধু দেখে এসেছে ওর কুণ্ঠিত, লজ্জিত, নতমূর্তি।

ক্ষণিকের এই উচ্ছ্বসিত হাসিতে ওর যেন আর একটা দিক খুলে গেল। সেদিকটা শুধুই একটি অভাবগ্রস্ত ঘরের সাহায্যপ্রার্থী ম্রিয়মাণ মেয়ে নয়, একটি প্রাণোচ্ছল তরুণী মেয়ে। যে মেয়ে হয়তো সত্যকার একটা মানুষের জীবন পেলে এমনি হাসিই জীবনভোর হাসতে পারবে।

লেখাপড়ায় ত্রুটি আছে।

কিন্তু সে ত্রুটি তো নিতান্তই বহিরঙ্গ! ওর ভিতরের ওই বুদ্ধি আর নিষ্ঠার সঙ্গে যদি টিউটরের চেষ্টা যুক্ত করা যায়, সে ত্রুটি পূরণ হতে কতক্ষণ?

মুহূর্তের চিন্তা মুহূর্তেই লয় পেল।

লজ্জিত হলো ইন্দ্রনাথ নিজের কাছেই। তারপর হেসে তাড়াতাড়ি বলল, 'কার মধ্যে যে কতটা সম্ভাবনা আছে, সে কথা আগে থেকে বোঝা শক্ত। উপযুক্ত ক্ষেত্রে এসে পড়লে তবে যোগ্যতা অযোগ্যতা প্রমাণিত হয়। এই ধরুন না কেন, আমি যদি আপনাকে এরকম কোন স্কুলে নিচুদিকের দু'একটা ক্লাসের ভার দিই, তাহলে আপনি হয়তো কোন গ্র্যাজুয়েট মেয়ের চাইতে কিছু কম করবেন না। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই!'

'ক্লাসের ভার? মানে, পড়ানোর ভার?'

আর একবার তেমনি করে হেসে ওঠে কমলা। ওরও বুঝি এই হাসির নেশা লেগেছে।

ইন্দ্রনাথ যেন চোখ ফেরাতে ভুলে যায়।

হাসতে হাসতে লালচে মুখে বলে কমলা, 'আমার সামনে বল্লেন বললেন, আর কারো সামনে যেন বলে বসবেন না। তবে হ্যাঁ, ক্লাস ঝাড়ু দেবার কাজটা যদি আমাকে দেন, তাহলে হয়তো সার্টিফিকেট পেতেও পারি।'

ইন্দ্রনাথও হেসে উঠে বলে, 'তাহলে প্রথম নম্বর তাঁতিনী, দ্বিতীয় নম্বর ঝাড়ুদারনী—'

দু'জনের হাসি এক হয়ে বাজতে থাকে।

'চলুন, যাওয়া যাক!'

বাসের রাস্তার দিকে এগোতে থাকে ইন্দ্রনাথ। এখন আর তার গাড়ি নেই। বাড়ি ছেড়ে আসার সঙ্গে গাড়িটাও ছাড়তে হয়েছে।

'মধ্য কলিকাতা সমাজকল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়'-এর মধ্যেকার অবস্থাটা খুব এমন উৎসাহকর নয়। তবু কমলাকে এনে অনেক উৎসাহে অনেক আশার কথা বলতে থাকে ইন্দ্রনাথ। আর সেই বহু কথা বলার মধ্যে যে কখন 'আপনি' থেকে 'তুমি' হয়ে গেছে, সেকথা নিজেই টের পায় না ইন্দ্রনাথ।

'সেই কথাই বলছি কমলা,—এইটুকু ঘর, ক'টিই বা ছেলেকে বসতে দেওয়া যায়? প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। মরুভূমিতে বিন্দুজল। তবু আমি হতাশ হই না। বুঝলে কমলা। চিরকালের যে প্রবাদ আছে, 'বিন্দু থেকেই সিন্ধু'—সে কথায় আমি বিশ্বাসী। আমি কল্পনা করি আমার সেই দেশের ছবি, যেখানে কেউ নিরক্ষর নেই, কেউ দরিদ্র নেই...'

কমলাকে বুঝি আজ হাসিতে পেয়েছে, তাই আবার হেসে উঠে ইন্দ্রনাথের সুরে বলে,...'কেউ চোর নেই, কেউ ডাকাত নেই।'

'না, চোর-ডাকাতটা থাকা দরকার।' উচ্ছ্বসিত কৌতুকে হাসতে থাকে ইন্দ্রনাথ,—'চোর-ডাকাত কিছু কিছু চাই। সর্বদা 'হারাই হারাই' ভাব না থাকলে আর মজা কী?'

এখন পড়ন্ত বিকেল, বিদ্যালয়ের বিদ্যাথারা নেই।

দু'একজন শিক্ষিকা, একজন কেরানী, চাকরটা, দারোয়ানটা এদিক ওদিক ঘুরছে, তারা সেক্রেটারির এহেন কৌতুক-হাসির শব্দ শুনে একটু চকিত হলো।

প্রাণখোলা হাসি হাসে বটে ইন্দ্রনাথ, কিন্তু এরকম একক কোন তরুণী সঙ্গে করে নয়।

'স্কুলবাড়ি থেকে বেরিয়ে ইন্দ্রনাথ বলল, 'উঃ কী ভীড়, বাসে চড়তে পারার আশা রাখেন? যাত্রীদের অবস্থা দেখুন!'

'আবার 'আপনি?' বাঃ!' কমলা একটু অভিমানের সুরে বলে।

'আবার মানে?' ইন্দ্রনাথ অবাক হয়ে তাকালো।

এতক্ষণ তো 'তুমি' বললেন !

'বললাম না কি ? ও হো হো ! কিছু মনে করবেন না, আমি ওইরকম অন্যমনস্ক ।'

'মনে করবো, যদি আবার 'আপনি' চালান ।'

ইন্দ্রনাথ ওর মুখের দিকে গভীর দৃষ্টি ফেলে বলে, 'তুমি' বললে খুশী হও ?

কমলা মাথা নিচু করে ।

না, এ দৃষ্টির দিকে তাকাবার ক্ষমতা তার নেই ।

'কই, বললেন না ?'

'হই ।'

'আচ্ছা ! একটা ট্যাক্সিই নেওয়া যাক, কী বল ?'

'ট্যাক্সি !'

মুহূর্তের জন্য একবার কেঁপে ওঠে কমলা ।

কেন ? এ প্রস্তাব কেন ! কী মতলব ? তবে কি—তবে কি ননীদার সন্দেহই ঠিক ? 'এসব বড় লোকের ছেলেরা সুন্দরী মেয়ে দেখলেই জ্ঞান হারায় !'

পরক্ষণেই নিজের মনে নিজেকে ছি ছি করে ওঠে কমলা ।

ছি ছি, কী তার পাপের মন !

ইন্দ্রনাথ ওর বিমনা ভাব লক্ষ্য করল । কী ভেবে বলল, 'তবে থাক । বাসেই যাওয়া যাক তেঁতুলগাছে বাদুড় ঝুলে ।'

কমলা লজ্জা ঢাকতে তাড়াতাড়ি বলে,—'কেন, কী হলো ? আমার তো শুনে বেশ মজাই লাগছিল ।'

'মজা !'

'হ্যাঁ ! কমলা স্থিরস্বরে বলে, 'গাড়ি চড়বার ভাগ্য আর আমাদের জীবনে কবে আসে বলুন ?'

না না, ভয় করবে না কমলা, কিছুতেই না । ভয় করে নীচ হবে

না, ছোট হবে না।

ট্যাক্সিতে চড়ে বসে ইন্দ্রনাথ আগের কথার জের টানে, '—সত্যি কমলা, নাও না আমার স্কুলের কিছু ভার। তাহলে আমি আরও ছেলেমেয়ে নিতে পারি।'

কমলা এবার গম্ভীর হলো। গম্ভীরভাবে বলল, 'আমাকে আপনি কী একখানা ভাবেন বলুন তো? মস্ত একটি বিদূষী?'

'না কমলা। মস্ত একটি বিদূষী তোমায় ভাবি না, কিন্তু মস্ত একটা সম্ভাবনা যেন দেখতে পাই তোমার মধ্যে।···কিন্তু সে কথা থাক। আমার তো খুব একটা বিদূষীর প্রয়োজন নেই। পড়াতে হবে তো বর্ণপরিচয়! এটুকু তুমি নিশ্চয় পারবে।'

ইন্দ্র কি বুঝছে, নিজেকেই নিজে ঠকাচ্ছে?

বুঝছে কি কমলাকে এই কাজ দেওয়ার আকুলতা, তাকে আরও বারবার দেখতে পাবার, বেশি করে কাছে পাবার অবচেতন বাসনা! ···না, ইন্দ্রনাথ সেকথা বুঝছে না। এমন অবস্থায় কেউই বোঝে না।

'তোমাকে অবশ্য আমি একেবারে অমনি খাটাব না।' ইন্দ্র হাসে।

আগের কথার জের টেনেই বলে, 'তোমার সময়ের বিনিময়ে সংঘের ফাণ্ড থেকে সামান্য কিছু পাবে। তবে সে সামান্যটা যৎসামান্যই।···জানোই তো এসব সংঘ-টংঘর ফাণ্ড কত কাহিল হয়?'

কমলা মুখ তুলে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, 'আমি আপনার কিছু কাজ করতে পেলেই ধন্য হয়ে যাবো।···আর কিছুই চাই না।'

ইন্দ্রনাথ কী উত্তর দিত কে জানে,—হঠাৎ কেমন একটা হৈ-হৈ উঠল, কানের উপর এসে আছড়ে পড়ল যেন অতি অপরিচিত কোন কণ্ঠস্বর, সঙ্গে সঙ্গে ঘ্যাঁচ করে থেমে গেল গাড়িখানা!

ওঃ, শুধু এ গাড়িখানায় নয়, পাশে আরও একখানা গাড়ি আচমকা থেমে গেছে।···ধাক্কা লাগছিল না কি?

ধাক্কা লাগতো নয়, লেগেছে। গাড়িতে গাড়িতে নয়, ধাক্কা লেগেছে ইন্দ্রনাথের বুকে···ধাক্কা লেগেছে তার চোখে।

তাই হঠাৎ থেমে-যাওয়া সেই মূল্যবান প্রাইভেট কার-খানার দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে ইন্দ্রনাথ।

কিন্তু সে আর কতক্ষণের জন্যে?

বড় জোর এক পলক!

নীহারকণা নেমে পড়েছেন পথের ওপর। সমস্ত রাস্তা সচকিত করে তাঁর আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়েছে, 'ও চন্দর,—এই তো সেই সর্বনাশী!'

কী ব্যাপার?

ইন্দ্রনাথ উদ্‌ভ্রান্তের মত গাড়ি থেকে নেমে পড়ে।

কিন্তু কমলা?

কমলা কি বেঁচে আছে?

'কাকে কী বলছো পিসিমা? এ হচ্ছে কমলা, আমাদের সংঘের একটি সদস্য।' ইন্দ্রনাথ বলে।

'রেখে দে তোর সদস্য। কমলা কেন···ওর আরও ঢের নাম আছে। কাকে কী বলছি? ঠিকই বলছি। ছলাকলা-উলি ডাইনীকে যা বলবার বলছি!···এই তো সেই অরুণা। যে সেদিন মা নিয়ে ছেলে নিয়ে বাড়ি বয়ে গিয়ে আমার সর্বনাশ করে এল! আমার সোনার চাঁদকে ঘরছাড়া করল। এখন আমাকে পথে পথে ঘোরাচ্ছে।···বাঃ, এখন যে আবার সিঁদুর মুছে ডবল বিনুনি ঝুলিয়েছ দেখছি! তাইতো বলি! এতবড় ঘোড়েল মেয়ে না হলে আমার চোখে ধুলো দিয়েছে, আবার আমার ইন্দুর নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে···'

'পিসিমা!'

ধমকে ওঠে ইন্দ্রনাথ, 'রাস্তায় আর একটি কথা নয়! এমন

পাগলের মত কথা বলছ যে তোমার মাথায় বরফ চাপানো উচিত। বাবা! আপনিও তো রয়েছেন, অথচ—'

নীহারকণা চেঁচিয়ে ওঠেন, '—ওর আবার থাকা না-থাকা! ও যদি মানুষ হতো, তাহলে কি আর এই এতদিন তোকে আমি ওই ডাইনীর কবলে ফেলে রাখতাম? ভাগ্যিস যাই এই ভালমানুষের ছেলেটি গিয়ে আমায় সন্ধান দিল! বল না গো বাছা!'

গাড়ির মধ্যে পাথরের পুতুলের মত স্তব্ধ হয়ে বসে থাকা ননীর দিকে দৃষ্টিপাত করেন নীহারকণা।

কিন্তু ননীই কি বেঁচে আছে? ট্যাক্সির মধ্যে সীটের কোণে গুঁজড়ে বসে থাকা কমলার পাংশু মুখখানা দেখেই সমস্ত চৈতন্য লুপ্ত হয়ে গেছে। ওই মুখ দেখামাত্রই অনুভব করতে পারছে ননী—কী কাজ করেছে সে! কী ভয়ংকর গর্হিত! কী গর্হিত, কী নীচ, কী ছোট।

ঈর্ষার জ্বালায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিল সে।

সহ্য করতে পারছিল না কমলা আর ইন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব। কিন্তু এত কৌশল করে, এত দুঃসাহস করে ইন্দ্রনাথের চোখ থেকে কমলাকে সরিয়ে ফেলে লাভই বা কী হবে ননীর? কমলা কি কোনদিন ক্ষমা করতে পারবে ননীকে?

ট্যাক্সি ড্রাইভারটা প্রথমে হকচকিয়ে গিয়েছিল, এখন গজ্‌গজ্‌ করে উঠল।

সে গাড়ি চালাতে বেরিয়েছে, তামাশা দেখবার সময় তার নেই। বাবু তাকে ছেড়ে দিক।

'আচ্ছা ঠিক আছে। ছেড়ে দিচ্ছি তোমায়।'

ইন্দ্রনাথ বলে। 'চলো পিসিমা বাড়িতেই চলো। তোমাদের কতকগুলো ভুল ভাঙুক! কমলা নেমে এসো তো। এ গাড়িতে উঠে এসো। দেখো এই হচ্ছেন আমার পিসিমা, আর ওই আমার

বাবা। মিথ্যে একটা ভুল করে ওঁরা তোমার অপমান করে বসেছেন, তার জন্যে আমি ওঁদের হয়ে মাপ চাইছি। এসো, নেমে এসো।'

কিন্তু নেমে আসবে কে?

নেমে আসবার ক্ষমতা কি কমলার আছে? ওই গাড়িতে ননীকে দেখেই সমস্ত ঘটনাটা জলের মত স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে তার চোখে। সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে থেকে অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে সমস্ত পৃথিবী।

'কমলা! কমলা!—কমলা!'

ঝুঁকে পড়ে ডাক্ দেয় ইন্দ্রনাথ। বিব্রত বিপর্যস্ত বেচারী ইন্দ্রনাথ! মেয়েটা এত সুকুমার! পিসিমা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে কী বললেন আর ও এমন হয়ে গেল!

পিসিমার বলার ধরনটাও কী কুৎসিত, অপমানকর!

এতখানি বয়সে প্রথম এই মনে হলো ইন্দ্রনাথের, নীহারকণা কী অমার্জিত, কি গ্রাম্য, কী অভদ্র!

চন্দ্রনাথ এবার গাড়ি থেকে নেমে এসেছেন।

উদ্বিগ্নভাবে বলেন, 'কী হল কী?'

'হবে আবার কী?' পিসিমা চাপা ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন। 'বুঝতে পারছিস না? হাতে-নাতে ধরা পড়ে গিয়ে এখন ভয়ে লজ্জায় মুচ্ছো যাওয়ার ভান করছেন! যে মেয়ে অতবড় থিয়েটার করে বেড়ায়, তার কাছে আর এ কতটুকু?···ওরে ইন্দু, অমন আগুনজ্বালা চোখে আমার দিকে তাকাবার আগে এই ভালমানুষের ছেলের কাছে শোন ওই লক্ষ্মীছাড়া মেয়ের ইতিবৃত্ত! বলোনা গো বাছা—ওমা একি!··· গেল কোথায় ছোঁড়া!'

হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন নীহারকণা।

এঁদের গোলমালের মাঝখানে নিঃশব্দে কখন চলে গেছে ননী।

'বাঃ, চমৎকার! তোমার বিশ্বস্ত সংবাদদাতা একেবারে হাওয়া?' নীহারকণার দিকে একটা ব্যঙ্গদৃষ্টি হেনে ইন্দ্রনাথ সহসা একটা কাজ

করে বসে। ট্যাক্সিটায় চড়ে বসে সশব্দে তার দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলে, 'এই ট্যাক্সি, চলো যাদবপুর।'

সামনে দিয়ে গাড়িটা চলে যায়, আর হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন নীহারকণা আর চন্দ্রনাথ। একটু পরে একটা নিশ্বাস ফেলে চন্দ্রনাথ বলেন, 'উঠে এসো দিদি! মনে হচ্ছে বারে বারে আমাদেরই ভুল হচ্ছে।'

'ভুল হচ্ছে!' নীহারকণা ক্রন্দনজড়িত স্বরে বলেন, 'ভুল হচ্ছে আমার? আমি তোকে স্ট্যাম্পো কাগজে লিখে দিতে পারি চন্দর, এ মেয়ে সেই মেয়ে। ও যতই নাম বদলাক আর ভোল বদলাক, হাজারটা মেয়ের থেকে একনজরে চিনে বার করতে পারবো আমি ওকে। ওর ছবি আমার বুকের মধ্যে খোদাই করা হয়ে আছে।'

'তাহলে তোমার এই—কি বলে, ননী বলে ছেলেটা সরে পড়লো কেন?'

নীহারকণা সনিশ্বাসে বলেন, 'সেই তো রহস্য!'

কিছুক্ষণ পাতালপুরীর স্তব্ধতা!

তারপর এক সময় ফের নীহারকণাই বলেন, 'আসল কথা বুঝছি, বিয়েই করেছে। নইলে অত বুক জোর? লক্ষীছাড়া ছেলে, করলি করলি! একটা অঘরে-কুঘরে বিয়ে করলি! আর সেই নিয়ে এমন ডুবলি যে আমাদের চিনতে পারছিস না! চন্দর, তুই কালই আমায় হরিদ্বারে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর। গুরু-আশ্রমে উঠোন ঝেঁটিয়ে বাসন মেজে খাবো,…তাও আমার মান্যের।'

এতক্ষণ পরে চন্দ্রনাথ একটু হাসেন।

ক্ষোভের, দুঃখের, তিক্ত ব্যঙ্গের।

'তুমি তো সুখী দিদি, তোমার তো তবু গুরু-আশ্রম আছে, মান্যের জায়গা আছে। ইচ্ছে হলেই চলে যেতে পারো সেখানে।'

কৃষ্ণমোহিনী গালে হাত দিয়ে বলে, 'ওমা একি! কী ব্যাপার বাছা? মেয়েকে আমার কোথায় নে' গিয়েছিলে যে, এমন অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে এসে পড়লো?'

ইন্দ্রনাথ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে।

ইনিই কমলার মাসি নাকি?

কমলাকে দরজার কাছাকাছি পৌঁছে দিয়ে গেছে ইন্দ্রনাথ অনেকদিন, বেড়ার এই দরজাটার বাইরের পিঠটা তার চেনা, এ পিঠটা কোনদিন দেখেনি। কমলাও অনুরোধ করেনি কোনদিন, বরং ইন্দ্রনাথকে মোড়ের মাথা থেকে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টাতেই তৎপরতা তার।

'আর আপনাকে কষ্ট করতে হবে না, ওই তো আমাদের বাড়ি, এবার ঠিক চলে যাব'—এই ছিল তার বুলি।

ইন্দ্রনাথ ভাবতো দারিদ্র্যের লজ্জা।

কিন্তু কৃষ্ণমোহিনীকে দেখেই তার বুকটা ছাঁৎ করে উঠল।

এ কি কোন ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বর?

আর মুখ? মুখের চেহারাতেও যেন স্পষ্ট ফুটে রয়েছে একটা কুৎসিত জীবনের গ্লানিকর ছাপ!

তবু ইন্দ্রনাথকে তো ভদ্রতা রাখতেই হবে!

তাই মৃদুস্বরে বলে, 'গিয়েছিলেন আমাদের একটা স্কুল দেখতে উত্তর-কলকাতায়। বোধহয় বেশী গরমে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছেন। অন্যত্র নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করতে গেলে দেরি হবে, আপনি চিন্তিত হবেন, তাই এখানেই নিয়ে এলাম।'

'তা তো এলে। কিন্তু ইস্কুল দেখাতে নিয়ে যাবার হুকুমটা কে দিয়েছিল বাছা? আমার এই ভরা বয়সের মেয়েকে যে তুমি কোথায়

না কোথায় নিয়ে বেড়াও, সেটাই কি ভাল কর? তারপর আজ এই কোথায় নিয়ে গিয়ে এই অবস্থা করে আনলে—কী জানি কী করেছ! বড়লোক বলে কি গরিবের মান-ইজ্জত রাখবে না? আমি যদি এখন লোক ডাকি! পুলিসে দিই তোমায়?'

হ্যাঁ, কৃষ্ণমোহিনী আজ ইন্দ্রনাথের সম্বন্ধে একটা হেস্তনেস্ত করতে বদ্ধপরিকর। ওর জন্যেই তার ব্যবসাপত্র লাটে উঠতে বসেছে।

হঠাৎ ইন্দ্রনাথের মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা বিদ্যুৎ-শিহরণ খেলে যায়।...তবে কি পিসিমার কথাই সত্যি? '

এ সবই ষড়যন্ত্র?...নইলে এ কী?

এ কি জঘন্য কুৎসিত ভাষা আর ভঙ্গি!

তবু নিজেকে প্রাণপণে সংযত রেখে ইন্দ্রনাথ বলে, 'লোক ডেকে আমাকে পুলিসে ধরিয়ে দেওয়ার চাইতে অনেক দরকারি কাজ হবে ডাক্তার ডেকে এঁর চিকিৎসা করানো।'

'ডাক্তারের খরচাটা তাহলে তুমিই দাও বাছা। দয়ার শরীর, পয়সা আছে, দেবে না কেন?'

হয়তো ইন্দ্রনাথ নিজেই ডাক্তার ডাকতে যেতো, কিন্তু নিচ এই কথার পর তার সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। দৃঢ়স্বরে বলে, 'না তা দেব কেন? আপনাদের মেয়ে আপনিই দেবেন। অবশ্য আপনি যদি সত্যিই এঁর আত্মীয়া হন।'

'কেন অবিশ্বাস হচ্ছে বুঝি?' কেষ্টমোহিনী মুখ সিঁটকে বলে, 'তা হবে বৈকি। আমি যে কাঙাল! এই কমলি, আর কতক্ষণ ভেক ধরে থাকবি? চোখ মেলে বুঝিয়ে দে না বাবুকে, আমি তোর সত্যি মাসি হই, না তুই রাজকন্যে, আমি ঘুঁটেকুড়ুনি।'

মির্জাপুর থেকে যাদবপুর কম রাস্তা নয়।

চলন্ত গাড়ির উদ্দাম হাওয়ায় অনেকক্ষণ আগেই আকস্মিক লুপ্ত হয়ে যাওয়া চেতনা ফিরে এসেছিল কমলার। কিন্তু নিদারুণ একটা

আতঙ্কে আর আশঙ্কায় চোখ খুলতে পারছিল না। নির্জীবের মত চুপ করে চোখ বুজে পড়েছিল।

না, কিছুতেই ইন্দ্রনাথের সামনে চোখ খুলতে পারবে না কমলা, পারবে না মুখ দেখাতে। ও আগে চলে যাক।—চোখ বুজে কল্পনা করছিল যদি এ অজ্ঞানতা না ভাঙতো!

কিন্তু আর পারল না নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বুজে থাকতে।

মাসির আক্রোশ যে কোথায় গিয়ে পৌঁছতে পারে, সে সম্বন্ধে ধারণা আছে যে কমলার। তাই ধীরে চোখ খুলে হাতের ইশারায় কেষ্টমোহিনীকে চলে যেতে বলে।

'অ! চলে যাব? তা যাচ্ছি।'

নাগিনী শেষ ছোবল মেরে যায়। 'কিন্তু এই পষ্টকথা বলে দিচ্ছি কমলি, তেমন বুঝলে আমিও ছেড়ে কথা কইব না।'

কী বুঝলে কী ছাড়বে না, সেটা উহ্য থাকে।

কেষ্টমোহিনী চলে যেতেই ইন্দ্রনাথ কমলার কুশল প্রশ্নের পরিবর্তে জলদ-গম্ভীর স্বরে বলে,—'যাক, জ্ঞান ফিরে এসেছে তাহলে? আশা করি আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে?···আমি শুধু জানতে চাই, তুমি আমার পিসিমাকে এর আগে কোনদিন দেখেছ?

'দেখেছি।'

কমলার স্বরে মৃদুতা নেই, জড়তা নেই. ও যেন নিজেই নিজের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দিতে দৃঢ়সঙ্কল্প।

ইন্দ্রনাথ বলে, 'তাহলে এসব সত্যি?'

কমলা ঘাড় হেলিয়ে বলে, 'সব সত্যি।'

'সমস্ত?'

'সমস্ত।'

'আশ্চর্য!···যাক, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তোমার এ ছদ্মবেশ এত সহজে ধরা পড়লো! কিন্তু তবুও বলবো তোমার জন্যে আমি দুঃখিত

কমলা।…যাক!'

ইন্দ্রনাথ যাবার জন্যে পা বাড়ায়।

হঠাৎ কমলা দ্রুত এসে ইন্দ্রনাথের পথ রোধ করে দাঁড়ায়, আর কেমন একটা তীব্র স্বরে বলে ওঠে, 'শুধু দুঃখ জানিয়ে চলে গেলে তো চলবে না, আমার সব কথা শুনে যেতে হবে।'

'কোন দরকার নেই আমার। আর তাতে প্রবৃত্তিও নেই।'

কমলা আচমকা অস্বাভাবিক জোরে হেসে ওঠে, অপ্রকৃতিস্থের মত হাসতে হাসতে বলে,—'প্রবৃত্তি নেই? তা থাকবে কেন? আমাদের রূপ দেখতে আপনাদের প্রবৃত্তি আছে, আমাদের হাসি দেখতে আপনাদের প্রবৃত্তি আছে, প্রবৃত্তি থাকে না শুধু আমাদের জীবনের জ্বালা দেখতে!…বলতে পারেন, পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মেয়েমানুষ শুধু পেটের ভাতের অভাবে পুরুষের প্রবৃত্তির আগুনে পুড়ে মরছে বলেই আমাকেও তাই করতে হবে কেন?…আমি কেন বাঁচতে চাইব না? বাঁচবার সহজ কোন রাস্তা যদি খুঁজে না পাই, কেন কাঁটাঝোপ দিয়েও যাবার চেষ্টা করবো না?…বলুন?…উত্তর দিন এর?'

'আপনি দয়ালু, আপনি পরোপকারী, আপনাকেই এর উত্তর দিতে হবে।'

উত্তেজনায় পাগলের মত দেখতে লাগে কমলাকে।

ইন্দ্রনাথ ঠিক এর জন্য প্রস্তুত ছিল না।

ঘৃণায় লজ্জায় তার অন্তরাত্মা সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছিল, এখানকার আবহাওয়া নিতান্ত কলুষিত বোধ হচ্ছিল, তাই তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছিল। সত্যিই কমলার সঙ্গে কথা কইবার প্রবৃত্তি তার ছিল না। কিন্তু—কমলার মধ্যে অপরাধিনীর ছাপ কই?

'তোমার কথা বুঝতে পারা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না কমলা।' ইন্দ্রনাথ গম্ভীর ভাবে বলে, '—পথ ছাড়ো, যেতে দাও।'

'না না না, আমার কথা আপনাকে শুনে যেতেই হবে! এরপর হয়তো আত্মহত্যা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না আমার, কিন্তু আপনার চোখে ছোট হয়ে, হেয় হয়ে গিয়ে, মরেও শান্তি হবে না আমার!'

এ কথার সঙ্গে সঙ্গেই সেই অগ্নিবর্ষী চোখের কোলে বন্যা উঁকি মারে।

'বেশ শুনবো তোমার কথা।'

ইন্দ্রনাথ ননীর একচেটে সিংহাসন সেই প্যাকিং-বাক্সটার ওপর বসে পড়ে বলে, 'এই বসছি। বলো, কী বলবার আছে।'

'আমার প্রথম কথাটাই আবার বলবো, কেউ যদি বাঁচতে চায়, পৃথিবী তাকে বাঁচতে দেবে না?'

'তোমার কোন ইতিহাসই আমি জানি না কমলা।'

'আমারই কি সবটা জানা আছে?' কমলা মাথা নিচু করে গাঢ়স্বরে বলে, 'শুনতে পাই ভদ্রঘরের মেয়ে ছিলাম, কেউ বা কারা ভুলিয়ে ধরে এনে বিক্রি করে দিয়েছিল এদের কাছে।—যাকে মাসি বলি সে আমার কেউ নয়।'

ইন্দ্রনাথ বলে, 'আমারও ঠিক ওই কথাই মনে হচ্ছে কমলা। এরা তোমার আত্মীয় হতে পারে না।···কিন্তু বলছিলে—'শুনতে পাও'—কে বলেছে সে কথা?'

'মাসিরই বন্ধুরা। যখন ঝগড়া হয় এরা তো আর তখন কেউ কারুর বন্ধু থাকে না; গালমন্দ দেয়; বলে হাটে হাঁড়ি ভাঙবো, তোর সব কথা বলে দেব। সেই ঝোঁকে বলে দিয়েছে আমায়। কিন্তু ওই মাসি বলে—।'

সহসা চুপ করে যায় কমলা। বোধকরি শক্তি সংগ্রহ করতে থাকে বলবার জন্যে।

ইন্দ্রনাথ একটু চুপ করে থেকে বলে, '—কী বলে ?'

কমলা মুখ তুলে দৃঢ়গলায় বলে,—'বলে যে, আমি তোকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করলাম তার শোধ দে।...বলে খারাপ হতে...। আমি তা পারব না...মরে গেলেও পারব না।' উত্তেজিত স্বরে বলে কমলা—'একদিন মরতেই গেলাম, কিন্তু ননীদা বললো—'

আবার থেমে গেল কমলা।

'ননীদা কে ?' বিস্মিত কণ্ঠে উচ্চারণ করে ইন্দ্রনাথ।

'ননীদা এমনি একটা ছেলে,' কমলা ঢোক গিলে বলে। 'কাছেই কোথায় থাকে, ছেলেবেলা থেকে আমায় খুব স্নেহ করত। আগে ওই মোড়ে চায়ের দোকানে কাজ করতো, আমাকে রাস্তায় দেখলেই বিস্কুট দিত। তারপর ও কী করে যেন ফটো তুলতে শিখল, ফটোর দোকানে চাকরি হলো, ভদ্রলোকেদের সঙ্গে মিশে মিশে অনেক বুদ্ধি হলো, ও তাই আমাকে পরামর্শ দিলে মাসির কথা শোনার থেকে অনেক ভাল কাজ লোক ঠকিয়ে খাওয়া।...বললে পৃথিবীসুদ্ধ লোকই তো লোক ঠকিয়ে খাচ্ছে! তাই—'

'কত বড় ছেলে তোমার ননীদা ?'

'আমার থেকে ছ' সাত বছরের বড়।'

ইন্দ্রনাথ সহসা একটু তীব্রস্বরে বলে উঠে,—'তা' সে তো তোমাকে বিয়ে করলেই পারে ?'

কমলা বলতে পারতো,—হ্যাঁ তাইতো ঠিক হয়ে আছে, বলতে পারতো—সেই আশায় তো দিন গুনছি, বলতে পারতো—দিন না ওর অবস্থার একটু উন্নতি করে—। কিন্তু বলতে পারল না। ইন্দ্রনাথের পিসিমার গাড়িতে বসে থাকা ননীর হিংসে কুটিল মুখটা ভেসে উঠল চোখের সামনে।

ওই নীচ ননীকে আর বিয়ে করতে পারবে না।

ননী নিজের হাতে নিজের মূর্তি আছড়ে ভেঙেছে।

নইলে ননীই কি কমলার আরাধ্য পুরুষ ছিল না এতদিন ?

সত্যি বটে, বিগত কতকগুলো দিন ইন্দ্রনাথের মহিমা কমলার সমস্ত সত্তা, সমস্ত চেতনা, সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি আচ্ছন্ন করে থাকলেও মনের মধ্যে ননীর কাছে একটা অপরাধ বোধের ভাড়ে পীড়িত হচ্ছিল,—কিন্তু এ কী করলে ননী !

তার এতদিন ধরে আঁকা ছবিটার ওপর এমনি করে কালির পোঁচড়া বুলিয়ে দিলে !

ননীর সেই কালিমাখা ছবিটা স্মরণ করে কমলা মাথা নেড়ে ইন্দ্রনাথের কথার জবাব দেয়, 'না তা পারে না। কারণ আমি করবো না।'

আমি করবো না।

ইন্দ্রনাথ মিনিটখানেক স্তব্ধ থেকে বলে, 'কিন্তু কেন ? ও তো তোমাকে স্নেহ করে। ও তোমার উপকার করেছে।'

'তা' করেছে সত্যি, একশোবার সে ঋণ স্বীকার করবো, কিন্তু আর কিছু করবার নেই আমার। বুঝতে পারছি আমি অকৃতজ্ঞ, আমি নিষ্ঠুর, বুঝেও উপায় নেই আমার।—কী করবো, অকৃতজ্ঞ হবার জন্যেই ভগবান আমায় গড়েছেন। মাসি বলে অকৃতজ্ঞ, ননীদা বলবে অকৃতজ্ঞ, আর আপনি ! আপনার হয়তো সেটা বলতেও প্রবৃত্তি হবে না।'

মাথা নিচু করে কমলা।

'আমি ? আমার সঙ্গে কৃতজ্ঞতা অকৃতজ্ঞতার প্রশ্ন কী ?'

'কিছুই নেই ?'

কমলা উত্তেজিত স্বরে বলে, 'আপনি মহৎ, তাই একথা বলতে পারছেন। কিন্তু আমি তো জানি আপনার কাছে আমি কী পেয়েছি, আর আপনাকে আমি—না, আমার কথা প্রকাশ করার ভাষা

আমার নেই।'

মাথাটা আবার নিচু করে কমলা।

ইন্দ্রনাথ মিনিটখানেক সেই আনত মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে বলে, '—একটা কথা এখনো খুব পরিষ্কার হয়নি।'

'কী?'

'ওই যে তোমার ননীদা, কী যেন পরামর্শ দিলে—'

'সেইতো! সেই জন্যেই তো!...কিন্তু সে বড় বিশ্রী কথা, শুনতে পারবেন কি আপনি?'

'শুনতে জগতে অনেক কিছুই হয় কমলা, কিন্তু থাক, তোমার হয়তো বলতে কষ্ট হবে।'

'না বলবো।'

দৃঢ়স্বরে বলে কমলা। তার পর ধীরে ধীরে বলে চলে আনুপূর্বিক ইতিহাস।

বলে, এই কুৎসিত পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হওয়ায় নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা, আবার মাসির নিষ্ঠুর পীড়নে সেই কাজেই প্রবৃত্ত হতে বাধ্য হওয়া।

একটির পর একটি লোক কী ভাবে তাদের শিকার হয়েছে, কী ভাবে ননী অদ্ভুত পদ্ধতিতে ফটোগ্রাফের কায়দায় সম্পূর্ণ অপরিচিত দুটো মানুষকে একত্রে জুড়ে এই শিকারের সহায়তা করেছে, শেষ পর্যন্ত কী ভাবে নীহারকণাকে প্রতারণা করে নিয়ে এসেছে তাঁর গলার হার, নগদ টাকা—সবাই বলে শেষ করে কমলা, একটা মরীয়া মনোভাব নিয়ে।

বলতে বলতে কখন বেলা শেষ হয়ে গেছে, কখন সোনারঙা আলো ঝিমঝিমে হতে হতে মিলিয়ে গেছে খেয়াল হয়নি দু জনের একজনেরও।

বাইরের পৃথিবীতে হয়তো তখনও একটু আলোর রেশ, কিন্তু

ঘরের মধ্যে নেমেছে অন্ধকারের যবনিকা। নিচু দেওয়াল টিনের চালারঘরে তো আরো তাড়াতাড়িই নেমেছে।

এখন আর কেউ কারুর মুখ দেখতে পাচ্ছে না। শুধু স্তব্ধতা।

শুধু মৃদু গভীর নিশ্বাসের শব্দ।

নাই বা থাকলো খুব বেশি বিদ্যে, নাই বা থাকলো কথার খুব বেশি বাঁধুনি।

কিন্তু সরল তো।···খাঁটি তো!

বুদ্ধিসম্পন্ন তো!···মার্জিতরুচি ভদ্রমেয়ে তো!

তাছাড়া—

সুন্দরীও তো।···অনুপম লাবণ্যময়ী···।

তা' মেয়েদের সৌন্দর্যও একটা গুণ বৈকি! লাবণ্য একটা ডিগ্রী বৈকি!

অনেকক্ষণ পরে ইন্দ্রনাথই স্তব্ধতা ভেঙে ধীরে ধীরে বলে, 'একটু আগে তোমাকে ধিক্কার দিচ্ছিলাম কমলা, এখন নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছি। ভাবছি, আমরা কত অল্পেই মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাই, শ্রদ্ধা হারাই। কার্যকারণ বিচার করি না, কোন্ অবস্থায় পড়লে কী করতে বাধ্য হতে পারে মানুষ, তা ভাবি না, নীচতাই যে মানুষের সত্যকার স্বভাব নয়, এসব কিছু না ভেবে বলে উঠি ছি ছি ছি। ···তোমার কাছে আমি ক্ষমা চাইছি কমলা।'

কমলা যেন ক্রমশ অভিভূত হতেও ভুলে যাচ্ছে। তাই শান্ত স্তিমিত স্বরে বলে, 'না না ক্ষমা কিসের? আমি কি জানি না আমি কত জঘন্য, কত নীচ, কত ইতর? তবু—তবু আরও নরকের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে আর কোনও উপায় আমি পাইনি।'

ইন্দ্রনাথ প্রশান্তভাবে বলে, 'তোমার পরামর্শদাতার বুদ্ধিটাই অদ্ভুত বাঁকা। ওর চাইতে ভাল কোন উপায় সে আবিষ্কার করতে পারলে না?

আশ্চর্য !'

কমলাও মৃত্নস্বরে জবাব দেয়, 'আশ্চর্য হবারও কিছু নেই। সেই বা ওর চাইতে ভালর সন্ধান পাবে কোথা থেকে? জীবনে ভাল সে দেখতে পেল কবে? পৃথিবীর কুৎসিত কুশ্রী দিকটাই দেখল, তার কাছে ভাল জিনিসের আশা করবো কী করে? তবু তো আমার যা কিছু জ্ঞানের আলো, যা কিছু বুদ্ধি চৈতন্য তার কাছ থেকেই পাওয়া। নিজের কত টানাটানি, তবু আমাকে লাইব্রেরি থেকে না কোথা থেকে বই এনে পড়ায়, কোথা থেকে না কোথা থেকে জোগাড় করে এনে দেয়।'

ইন্দ্রনাথ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলে, 'কিন্তু কমলা তুমি তো তাকে শ্রদ্ধাই করো, ভালও বাসো অবশ্যই. তবে তাকে বিয়ে করতে বাধা কী?'

'সে কথা বলতে পারব না।...তবু বলবো বাধা আছে। সে আর হয় না।...কিন্তু বিয়েতে দরকারই বা কী? একটা জীবন এমনি কেটে যেতে পারে না? আমি তো দেখেছি আপনাকে, দেখেছি আপনার সংঘের কাজ, দেখে বিশ্বাস এসেছে হয় তো চেষ্টা করলে আর একটা পথ খুঁজে পাব। সৎ পথ—সভ্য পথ! কিন্তু আমার ভাগ্যই আমার বৈরী।

ভাগ্য কারো চিরদিন বৈরী থাকে না কমলা। ইন্দ্রনাথ আন্দাজে কমলার কাঁধে একটা হাত রেখে গাঢ়স্বরে বলে, 'এবার আমার ভাগ্যের সঙ্গে তোমার ভাগ্যকে বেঁধে নেব, দেখি এরপর সে আর বৈরিতা সাধন করতে পারে কি না!'

'কী বললেন?...কী বললেন আপনি?'

কমলা যেন ছটফটিয়ে ছিটকে ওঠে।

'এমন পাগলের মত খামখেয়ালী কথা বলবেন না!'

'কথাটা পাগলের মত কিনা জানি না'—ইন্দ্রনাথ মৃত্ন হেসে বলে, "কিন্তু খামখেয়ালী খেয়ালের নয়।...এ আমার ইচ্ছে, বাসনা।...হয়তো

কয়েক ঘণ্টা আগেই তোমাকে একথা বলতাম আমি, যদি না মাঝখানে এতটা সময় এই গোলমালে নষ্ট হ'ত।'

'সে আলাদা কথা। কমলা তীক্ষ্ণ আর্তনাদের মত বলে, 'তখন কি আপনি আমার পরিচয় জানতেন ?···জানতেন আমি কী ?'

'না, কমলা তা জানতাম না সত্যি'—ইন্দ্রনাথ বলে, 'তাই তখন ছিল শুধু ভালবাসা। এখন তার সঙ্গে যুক্ত হল শ্রদ্ধা। আজ যাই, যত তাড়াতাড়ি পারি তোমাকে এই নরক থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাব। তবে—'

ইন্দ্রনাথ হেসে ওঠে সহজ প্রসন্ন হাসি, 'সেখানে আবার ওই পিসিমা ! কী করবো বল, 'মাসি পিসি' ভাগ্যটা তোমার সুবিধের নয় !'

'না, না, না !'

কমলা আবার আর্তনাদ করছে,—'এ হয় না ! এ অসম্ভব !'

'হয় কমলা !' ইন্দ্রনাথ দৃঢ়স্বরে বলে, 'জগতে অসম্ভব বলে কিছুই নেই। পাঁক থেকে পদ্ম তুলে দেবতার চরণে দেওয়া যায় জানো তো ? কেন যায় জানো ? পদ্মের গায়ে পাঁক লাগে না বলে।'

'কিন্তু আপনি বুঝছেন না। আমি কোন্ মুখে আবার আপনাদের বাড়িতে—না, না, না !··এমন ভয়ঙ্কর আদেশ আপনি আমায় করবেন না !'

'আদেশই যদি বলছ তো' —ইন্দ্রনাথ ফের হাসে—'না হয় বলো শাস্তি, ভয়ংকর দোষ করেছ, তার শাস্তিটাও ভয়ংকর হোক ! কিন্তু আজ যাই, অন্ধকার হয়ে গেছে, অস্বস্তি হচ্ছে। কোন্‌খান দিয়ে গেলে তোমার ওই মাসির সামনে পড়তে হবে না বলো দিকি, সেই পথ দিয়ে যাই। উঃ, কী সাংঘাতিক !'

মৃদু হেসে চলে গিয়ে ইন্দ্রনাথ আবার কী ভেবে ফিরে এসে বলে, 'কিন্তু কমলা, সেই ভাড়া-করা ছেলেটাকে একবার দেখাতে পার আমায় ?'

কমলা ভীতকণ্ঠে বলে, 'কেন ?'

'একবার দেখতাম। শুনেছিলাম নাকি অবিকল আমার মত দেখতে।'

কমলা নিশ্চিন্ত হয়ে হাসে।

'ওটা পিসিমার মনের ভ্রম। আপনার মত ফর্সা তাই!'

ইন্দ্রনাথ চলে যায়।

কমলা সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে দেবার কথা বিস্মৃত হয়ে বসে থাকে পুতুলের মত।

এ কী হলো!

এ কী হলো!

কমলার ভাগ্যদেবতা কমলার সঙ্গে এ কী নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের খেলা খেলতে চাইছেন!

তবু সমস্ত আবেগ উত্তেজনা, ভয় আতঙ্কের দুরন্ত আলোড়ন ছাপিয়ে, কাঁধের উপর মৃদু একটি স্পর্শের অনুভূতি মৃদু একটি সৌরভের মত জড়িয়ে থাকে সমস্ত সত্তাকে, সমস্ত চেতনাকে।

আশ্চর্য! আশ্চর্য!

এখনো কমলা বেঁচে আছে!

সেই অসহ্য সুখে মরে যায়নি সেই মুহূর্তে!

'তখন ছিল শুধু ভালবাসা, এখন তার সঙ্গে যুক্ত হল শ্রদ্ধা।' —একথা কার জন্যে উচ্চারিত হলো ?

কমলার জন্যে ?

কিন্তু···কিন্তু এত সুখ কি মানুষের সহ্য হয় ?

বন্যার জলে কি তৃষ্ণা মেটে ?

দাবানলে কি শীত ভাঙে ?

না না, এত সুখ সহ্য করতে পারবে না কমলা।

যুদ্ধে পরাজিত সেনাপতির মত ফিরে এলেন নীহারকণা। এত-খানি অপমানিত অপদস্থ জীবনে কখনো হননি বললেও কিছুই বলা হয় না। এ যেন মরেই গেছেন তিনি।

সব কিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

মনে হচ্ছে, হয়তো বা গোড়া থেকে আজ পর্যন্ত সবটাই কোন গভীর ষড়যন্ত্র। নইলে যে ছেলেটা খবর দিয়ে নিয়ে এল হাতে-নাতে ধরিয়ে দিতে, সে হঠাৎ পালালো কেন ?

আর ইন্দ্র ?

অপরাধী কখনো অতখানি বুকের পাটা দেখাতে পারে ? কিন্তু মেয়েটা···? সে যে সেই সেদিনের মেয়েটা তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। একেই তো রীতিমত মনে রাখবার মত মুখ চোখ, তাছাড়া নীহারকণার বুকের ফলকে আগুনের অক্ষরে আঁকা আছে যে সে মুখ। তার ওপর আবার প্রধান সন্দেহজনক—বেগতিক দেখে মূর্ছা যাওয়া।

তবে ?

অঙ্কগুলো ঠিক দেখাচ্ছে, যোগফল মিলছে না। আরো তাঁর মর্মান্তিক দুঃখ, চন্দ্রনাথ যে কার পক্ষে বোঝা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে সন্দেহ হচ্ছে নীহারকণাকেই যেন মনে মনে দোষী করছেন তিনি। যেন নীহারকণার সেই দোষ বুঝেও নীরব হয়ে আছেন শুধু ধিক্কারে।

তা' মুখ ফুটে কেন বলুক না চন্দ্র, 'দিদি তোমার ভুল হয়েছে।' তাও বলবে না, শুধু কেমন একরকম নীরেট পাথরের মত মুখ করে বসে থাকবে।

ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে নীহারকণার।

ওঃ, এই জন্যেই বলে পরের ছেলের ওপর বেশি মায়া ঢালতে নেই। স্বয়ং মা যশোদাই যে বলেছেন, 'কাকের বাসায় কোকিল থাকে

যতদিন না উড়তে শেখে, উড়তে শিখে ধর্ম রেখে চলে যায় সে অন্যবন।'
—পর কখনো হয় কি রে আপন?

এত বড় একটা দৃষ্টান্ত চোখের সামনে থাকা সত্ত্বেও কেনই যে মানুষের শিক্ষা হয় না !

গুম্ হয়ে বসে থাকলেন নীহারকণা অনেকক্ষণ, তারপর হঠাৎ সংকল্প স্থির করে ফেললেন। হেস্ত নেস্ত একটা করা দরকার। স্পষ্টা-স্পষ্টি জিগ্যেস করবেন চন্দ্রনাথকে—কী সে চায়। যদি বলে যে নীহারকণাই যত নষ্টের গোড়া, তা বলুক! বেশ! চলে যাবেন নীহারকণা। আর কিছু না হোক, বাবা বিশ্বনাথের কাশী তো কোথাও পালিয়ে যায়নি?

থাকুক চন্দ্র যেমন ভাবে থাকতে ইচ্ছে।

ছেলের পায়ে ধরে ডেকে আনুক, আনুক তার সেই মায়াবিনী ছলনাময়ীকে, সংসারকে আঁস্তাকুড় করে বাস করুক সুখে স্বচ্ছন্দে।

'চন্দ্র !'

এসে বসলেন নীহারকণা চন্দ্রনাথের ঘরে।

'কী দিদি !

'বলি, তুই যে একেবারে মৌনব্রত নিলি, এর মানে?'

'তাছাড়া—' একটু হাসলেনই চন্দ্রনাথ, 'আর কী করবো?'

'এতবড় একটা কাণ্ড চোখের ওপর দেখে এলি, সে বিষয়ে কী বুঝলি না বুঝলি একটা আলোচনা করবি তো?'

চন্দ্রনাথ মৃদুস্বরে বলেন, 'সব কথাই কি আলোচনার উপযুক্ত?'

'বেশ, তোর মনের কথাটা তো খুলে বলতে পারিস? মনের কথা চেপে গুম হয়ে বসে থাকাই জগতের যত অনর্থের মূল তা' জানিস? —হতে পারে তোরা বাপবেটা খুব বুদ্ধিমান, কিন্তু জগতের সবাই তো তোদের মত এতবড় বুদ্ধিওলা নয়; তারা যদি তোদের ইচ্ছে অনিচ্ছে

রুচি পছন্দর দিশে না পায়? জগতের এই সব কম বুদ্ধি লোকেদের জন্যে কিছু সহজ ব্যবস্থা না রাখলে চলবে কেন?'

'তুমি কি বলতে চাইছ আমি বুঝতে পারছি না দিদি।'

'বলতে আমি কিছু চাইছি না চন্দর, তুমি বল তাই শুনতে চাইছি। আজকের ঘটনাটা দেখে কী মনে হলো তোমার বল শুনি।'

'মনে? যদি মনে কিছু হয়ে থাকে তো এই হলো আমরা 'স্বচক্ষে দেখা'র যুক্তি দিয়ে কতই না বড়াই করি! আমাদের এই চোখে দেখার সীমানার বাইরে আর একটা যে অদেখা জগৎ আছে সে কথাটা ভুলেই থাকি। 'স্বচক্ষে' দেখাটাও একটা বিরাট ফাঁকি হতে পারে—'

'দ্যাখ চন্দর, গোলমেলে কথা রাখ। আমি হচ্ছি খাঁটি কথার মানুষ। স্পষ্ট করে বল ইন্দ্রর সঙ্গে ওই মেয়েটার কোন দূষ্য সম্পর্ক আছে কি নেই? কী তোর বিশ্বাস?'

'ইন্দ্রর সঙ্গে কারুর কোন দূষ্য সম্পর্ক থাকতে পারে, একথা আমার পক্ষে বিশ্বাস করা অসম্ভব দিদি।'

'তা' হলে বল আর কি?...লুকিয়ে সে ওকে বিয়ে করেছে?'

'বিয়ে করলে সে লুকিয়ে করত না।'

'তবে কথাটা কী দাঁড়াচ্ছে চন্দর? সেদিন থেকে আজ অবধি এই যে ঘটনাটা ঘটল সমস্তই বাজিকরের ভোজবাজি?'

'এমন অদ্ভুত কথা আমি বলি না দিদি, শুধু এটা অনুভব করছি কোথাও কোনখানে একটা কিছু ষড়যন্ত্র চলছে।'

'তাই যদি, তো ইন্দুরই খুলে বললে কী মহাভারত অশুদ্ধ হয়? সব সরল হয়ে যায় তা'হলে।'

'বলতে ওর ধিক্কার আসে দিদি। আমরা যে তাকে অবিশ্বাস করেছি, এইটাই তো আমাদের পক্ষে ভয়ঙ্কর একটা লজ্জার কথা! সে আবার কোন্ লজ্জায়—'

'থাম তুই চন্দর, সংসার চলে সাধারণ মানুষ দিয়ে। অত কাব্যি কথা সবাই বোঝে না। আমি বুড়ো-হাবড়া মুখ্যু মেয়েমানুষ, আমি যদি একটা গোলকধাধাঁয় পড়ে দিশেহারা হই—বুঝিয়ে দিতে হবে না আমায় ?'

চন্দ্রনাথ বলেন, 'গোলকধাঁধাঁয়ও পড়তে হত না, আর দিশেহারাও হতে হত না দিদি, শুধু যদি ইন্দ্রর ওপর বিশ্বাস রাখতে পারতে।'

'বেশ'—নীহারকণা থমথমে মুখে বলেন, 'আমি পারিনি, তুমি তো পেরেছ ? ফয়সালা একটা কর !'

'জোর করে ঠেলেঠুলে কিছু করা যায় না দিদি, যখন সময় আসে সমস্ত জটিলতার জাল আপনিই খুলে পড়ে, সমস্ত ভুল ধারণা ভুল বলে ধরা পড়ে। ঠিক সময়টি আসার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়।'

'অপেক্ষা করতে হয় ? ও !'

নীহারকণা তীব্রস্বরে বলেন, 'মানুষ বোধকরি 'অমর' বর নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে, তাই সব কিছুর জন্যে অপেক্ষা করবার সাধনা করবে ? আমি তোমাকে এই বলে রাখছি চন্দর, ইন্দুর কাছে আমি যাবো। সেই মেয়েকে আমি আর একবার দেখবো, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করব 'বল তোদের দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক কী ? দেখি কী উত্তর দেয়।—বেগতিক দেখে মূর্ছা গিয়ে বসতে পারলেই কি সব সময় পার পাওয়া যায় ?'

'অপেক্ষা ! অপেক্ষা ! বলতে পারলিও তো। অপেক্ষা করবারও একটা মাত্র আছে। ছেলেটা আজ এই এতদিন বাড়িছাড়া, কোন মায়াবিনী যে তাকে—'

সহসা বিদ্যুৎ গতিতে বাচ্চা চাকরটা এসে বিদ্যুৎ বেগেই খবর দেয়, 'পিসিমা, দাদাবাবু।'

'দাদাবাবু ! কী দাদাবাবু ?'

'দাদাবাবু এয়েছে।'

'এ্যাঁ। কী বললি?'

নীহারকণা পরনের থানের আঁচল লুটোতে লুটোতে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে পাগলের মত বলেন, 'কোথায়? কোথায় সে মুখপোড়া হতচ্ছাড়া ছেলে! বাইরে এসে চাকর দিয়ে খবর পাঠিয়েছে?… চন্দর, তুই বসে রইলি?'

ভাইকে ধিক্কার দিয়ে ছুটে নিচে নামতে গিয়ে বাধা পান নীহারকণা।

ইন্দ্রনাথ ওপরে উঠছে।

৮

আসছিলেন পাগলের মত, কিন্তু যে মুহূর্তে দেখা, চট করে নিজেকে সামলে নিলেন নীহারকণা, গম্ভীর হয়ে গেলেন, বললেন 'ওঃ ইন্দ্রনাথবাবু! হঠাৎ এ বাড়িতে যে?'

ইন্দ্রনাথ বোধকরি বর্মাবৃত চিত্তেই এসেছে। তাই প্রসন্নহাস্যে বলে, 'এলাম, কথা আছে।'

'কথা?'

নীহারকণা ভুরু কুঁচকে বলেন, 'আমার সঙ্গে কিসের কথা?'

'আছে আছে। চল না।' পিসিকে প্রায় বেষ্টন করে ঠেলতে ঠেলতে ওপরে ওঠে ইন্দ্রনাথ।

প্রাণটা জুড়িয়ে যায় নীহারকণার।

তবু স্বভাব যায় না ম'লে, তাই অমায়িক মুখে বলেন, 'তা সে মেয়েটির খবর কী? মূর্ছা ভেঙেছে?'

ইন্দ্রনাথ বিচলিত হবে না।

তাই সহজ সপ্রতিভ কণ্ঠে বলে, 'আপাতত ভেঙেছে।—এখন চল সব শুনবে। শুনে তুমিই হয়তো আবার মূর্ছা যাবে।'

'আমাদের অত মোমে-গড়া শরীর নয় খোকা যে মূর্ছা যাবো। তা' কথাটা কী?'

'বাঃ, মস্ত একটা দামী খবর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুনে নেবে? তা

হবে না! রীতিমত আসনে বসে হাতে সুপুরি নিয়ে শুনতে হবে।'

'ঢং রাখ খোকা! বল আমায়। তোর এ স্ফূর্তির মানে বুঝছি না। দেখি কী বার্তা এনেছিস!'

হ্যাঁ শুনলেন!

স্থির হয়েই শুনলেন সব।

ব্যঙ্গ করে ইন্দ্রনাথকে বলেছিলেন নীহারকণা 'শুনি, কী বার্তা?'

কিন্তু সত্যিই কি ভাবতে পেরেছিলেন সে বার্তা এত ভয়ঙ্কর হবে? ভাবা সম্ভব?

আশ্চর্য! আশ্চর্য!···বলতে একটু বাধল না?···মায়াবিনী জাদুকরী এমন জাদুই করলো!

চন্দ্রবাবুর যে বড্ড লম্বাচওড়া কথা হচ্ছিল, 'স্বচক্ষে' দেখাটাও কিছু নয়, বরং নিজের চোখকে অবিশ্বাস কোরো তবু বিশ্বাসভাজনকে অবিশ্বাস কোরো না। নাও এখন শোনো এসে?

উঃ কী ভয়ঙ্কর!

এসে আর শুনতে হয় না চন্দ্রনাথকে, নীহারকণা নিজেই গিয়ে শুনিয়ে আসেন। সবিস্তারেই শোনান, 'এখন বুঝতে পারছ ব্যাপার? হাতেনাতে ধরা পড়ে গিয়ে বাছা এখন এক আষাঢ়ে গল্প ফেঁদে সুয়ো হতে এলেন! নাও তোমরা এখন সেই ঘর-ঘরকন্না করা বৌকে নতুন-করে সিঁথিমৌর পরিয়ে দুধে আলতার পাথরে এনে দাঁড় করাও! তোমার খাঁটিছেলে আবদার নিয়েছেন—আঁস্তাকুড়ের জঞ্জাল এনে লক্ষ্মীর চৌকিতে তুলবেন, তুমি সে গোড়ে গোড় দাও গিয়ে। উঃ আমি শুধু ভাবছি চন্দর কী ডাকিনীদের খপ্পরে গিয়েই পড়েছিল বাছা, তাই অমন সরল সদানন্দ ছেলে এমন হয়ে যায়। এত প্যাঁচোয়া বুদ্ধি ওকে দিচ্ছে কে? ওই শয়তানীরা ছাড়া?'

বলা বাহুল্য চন্দ্রনাথ নীরব।

'বলি চুপ করে রইলি যে ?'

'বলবার আর কিছু নেই দিদি।'

'তোর কী মনে হচ্ছে ? ইন্দুর সব কথা সত্যি ? আমায় তো তখন খুব 'হেয়' দিলি। বলি, এখন সেই সর্বনাশীদের মন্ত্রণা নিয়ে এসেছে কিনা ইন্দু ? নইলে যে ছেলে কাল অত তেজ দেখিয়ে মুখের সামনে দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল, আজ সে একগাল হাসি নিয়ে 'বিয়ে দাও আমার' বলে আবদার করতে আসে ?'

সহসা উঠে দাঁড়ান চন্দ্রনাথ। ক্লান্তস্বরে বলেন, 'তোমার কথাই বোধ হয় ঠিক দিদি।'

'যাক তবু মানলি ! কিন্তু ও যা চাইছে তার কী ?'

চন্দ্রনাথ আর একবার ক্লান্ত দৃষ্টি মেলে বলেন,—'কী চাইছে ?'

'এই দেখ ! সপ্তকাণ্ড রামায়ণ শুনে বলে কি না সীতা কার পিতা ! ও যে বলছে এইখান থেকে আমরা ওকে ওই ছুঁড়ির সঙ্গে নেয্যমত বিয়ে দিই ?'

চন্দ্রনাথ ধীর স্বরে বলেন, 'যা হয় না তা হওয়ানো যায় না দিদি !'

'যা হয় না !'

নীহারকণা একবার বিচলিত দৃষ্টিতে ভাইয়ের মুখের দিকে তাকান, বোধকরি বুঝতে চেষ্টা করেন চন্দ্রনাথের এ কথাটা ঠিক কোন্ পর্যায়ের। নীহারকণাকে ব্যঙ্গ ?...না কি ছেলের এই সব দুষ্টু, প্যাঁচালো বুদ্ধিতে এসে গেছে বিরূপতা ?

তাই মনে হচ্ছে—

বিয়ের কথা উড়িয়ে দিতে চাইছে।

সহসা নীহারকণা ভয়ানক একটা উল্টোপাল্টা কথা কয়ে বসলেন।

'যা হয় না তা হবে না বলে দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে তো চলবে না চন্দর। ছেলের বিয়ে দিতেই হবে।—আর ছেলে যদি রাস্তার ভিখিরীর

মেয়েটাকেও বিয়ে করতে চায় তো তাই দিতে হবে। যেমন যুগ পড়েছে।—আমি এই চললাম পুরুতকে খবর দিতে!'

বলে মেদিনী কাঁপিয়ে চলে যান নীহারকণা। বোধকরি তদ্দণ্ডেই পুরুতকে খবর দিতে।

এই স্বভাব নীহারকণার।

যে কোন ব্যাপারে অপরের বিরুদ্ধতা তিনি করবেনই। তাতে প্রতিপদে পরস্পরবিরোধী কথা বলতে হয় বলধেন, দ্বিধামাত্র না রেখে সজোরেই বলবেন। যতক্ষণ চন্দ্রনাথ ছেলের সমর্থন করছিলেন ততক্ষণ নীহারকণা সেই একান্ত স্নেহপাত্রের উপরও খড়্গহস্তের ভূমিকা নিয়ে যুদ্ধ করছিলেন। যেই দেখা গেল চন্দ্রনাথ ছেলের ব্যাপারে হতাশ হচ্ছেন, সেই মুহূর্তে নীহারকণা তার দিকেই হাল ধরলেন।

হয়তো একা নীহারকণাই নয়, সংসারে এমন লোক আরো অনেক আছে। অপরের মতখণ্ডন করবার দুর্নিবার বাসনায় অহরহ তারা নিজের মত খণ্ডন করে। অপরের সমর্থিত নীতিকে 'নস্যাৎ' করবার জন্য সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলতে লেশমাত্র দ্বিধা করে না।

নীহারকণা এমনিই।

তবু নীহারকণার স্নেহটা মিথ্যা নয়।

ইন্দ্রনাথের অভাবে যে শূন্য মন অবিরাম হাহাকার করছিল, সে মন ইন্দ্রনাথের জন্য বড় একটা কিছু করতে চাইছিল। হয়তো অবচেতনে, হয়তো অবচেতনেরও অগোচরে।

চন্দ্রনাথের সঙ্গে বিরুদ্ধতার পথ ধরে সেই বাসনাটা মেটবার পথ হলো।

তা ছাড়া অনেকদিনের সঞ্চিত সেই নিরুদ্ধ বাসনা। যে বাসনাকে

ইন্দ্রনাথ তার ছাই-পাঁশ দেশের কাজের ছুতোয় বিকশিত হতে দেয়নি।

এতটা কর্মক্ষমতা, এতটা এনার্জি সমস্তই আজীবন বরবাদ হয়ে চলেছে।

এত স্তিমিত জীবন ভাল লাগে মানুষের?

ইন্দুর বিয়ে হলে নীহারকণা অন্তত এই স্তিমিত জীবনের হাত থেকে রেহাই পান।

অবিশ্যি বিয়ে করছে এমন ঘরে যে, লোকের কাছে বলবার নয়, নিজেরও ঘেন্না আসছে, কারণ যা কিছুই বলুক ইন্দ্রনাথ, সে মেয়েকে তিনি জীবনেও বিশ্বাস করতে পারবেন না।

সেদিনের সেই ভাবে-ঢলঢল চোখ ছলছল মেয়েটি তো? সে তো পাকা অভিনেত্রী! ইন্দু এখন তার আষাঢ়ে গল্প শুনে মোহিত হতে পারে—নীহারকণা হবেন না।

তা ছাড়া সেই ছেলেটা?

তাকে কী করে মন থেকে মুছে ফেলবেন নীহারকণা? ছেলেটা যে ওই মেয়েটার তাতে কোনও সন্দেহ নেই নীহারকণার, তবে হ্যাঁ ইন্দ্রর সন্তান নাও হতে পারে। জোচ্চোর মেয়েমানুষ ত্বটো উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে কিছু হাতাতে এসেছিল।

হায় ভগবান! দিলে দিলে, এমন কুৎসিত এমন বিকৃত জিনিসটা দিলে কেন নীহারকণাকে? এর চাইতে একটা ভদ্রঘরের কালো কুৎসিত মেয়েও যদি—

তবু এ বিয়েতে কোমর বাঁধবেন নীহারকণা।

মনকে তিনি প্রস্তুত করে নিচ্ছেন।

'যেমন যুগ পড়েছে', এই তার সান্ত্বনা! এখনকার ছেলেমেয়েরা তো জাত অজাত কিছু মানছে না, সত্যিকার থিয়েটার বায়স্কোপের মেয়ে-ছেলেদের বিয়ে করে পরমার্থ লাভ করছে! একটা বিয়ে ভেঙে তক্ষুনি

আর একটা বিয়ে করছে, আরো কী করছে আর কী না করছে !

কন্দর্প যে অন্ধ, এ সত্যটা এ যুগে বড় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অতএব মেনেই নিচ্ছেন তিনি।

কী আর করবেন !

বৌটাকে একবার গঙ্গায় চুবিয়ে আনবেন, জগন্নাথের মহাপ্রসাদ খাইয়ে দেবেন, আর নিত্য শিবপূজো ধরাবেন।

দস্যু রত্নাকরের পাপ কেটেছিল, বিল্বমঙ্গলের পাপ কেটেছিল, আরও আরও কত মেয়েপুরুষেরই এমন মহাপাপ কেটে যাওয়ার উদাহরণ বেদে পুরাণে আছে, আর একটা বিশবাইশ বছরের মেয়ের পাপ কাটানো যাবে না ?

তবে হ্যাঁ, বাড়ির চৌকাঠের ওধারে পা-টি ফেলতে দেবেন না তাকে।

বাচালতা বেহায়াপনা সব টিট্ করবেন। সেই মা না মাসি মাগী ! তাকে ত্রিসীমানায় আসতে দেবেন না।

বৌকে আরও কী কী করতে দেবেন আর দেবেন না, তার কল্পনায় বিভোর হতে থাকেন নীহারকণা।

এটাও কম পুলকজনক নয়।

বেয়াড়া একটা কিছু টিট্ করতে পারার মত সুখ কটা-ই বা আছে জগতে ?

তা ছাড়া আপাততও রয়েছে কাজ।

বিয়ের ঘটা বাদে—

আত্মীয়-স্বজনের কাছে মুখ রাখবার জন্যে গল্প বানানো। রেখে ঢেকে বানিয়ে গুছিয়ে বলতে হবে তো ! হবে বলতে 'মা বাপ মরা গরিবের মেয়ে, পয়সার অভাবে বিয়ে হচ্ছিল না, তাই। ইন্দুর আমার দয়ার শরীর, কথা দিয়ে বসেছে··· ।'

'আমি কি ওই ডোমের চুপড়ি-ধোওয়া মেয়েকে ঘরে আনতে সহজে মত দিয়েছি? ওই নিয়ে ছেলের মান অভিমান, বাড়ি ছেড়ে কোথায় না কোথায় গিয়ে পড়ে থাকা। সেখানে বাছার হাড়ির হাল একেবারে। আর শক্ত হয়ে থাকতে পারলাম না, মত দিয়ে মরলাম। বলি থাকগে মরুক গে, গয়নাগাঁটি তত্ত্বতাবাস না হয় নাই হলো, ইন্দুর আমার অভাব কী?'

আষাঢ়ে গল্পে কেউ কম যায় না।

অনর্গল বানাতে থাকবেন নীহারকণা, কাহিনীকে জোরালো করবার জন্যে নতুন নতুন সংযোজনা করেন।

ইন্দু যে বাড়ি ফিরেছে, নিজের ঘরে ও নিজের থালায় ভাত খাচ্ছে, এই কৃতার্থতায় সব কিছুই করতে প্রস্তুত নীহারকণা।

এদিকে এই নাটক চলছে, ওদিকে কুরুক্ষেত্র চলছে কেষ্টমোহিনীর সংসারে।

কমলা চলে গেছে।

ওদের তাঁত-স্কুলেরই এক ছাত্রীর বাড়িতে থাকতে গেছে। বয়সে অনেক বড় সে, তা হোক বন্ধু হয়ে গেছে। বাড়িতে অশান্তি বলে কয়েকদিনের আশ্রয় চেয়েছে।

সেখানে এই ক'দিন ধরে শুধু ভাবছে কমলা। আকাশ-পাতাল ভাবছে!

সেই ভাবনা।

সমুদ্রের জলে কি তৃষ্ণা মেটে?

ওদিকে কেষ্টমোহিনী বুক চাপড়াচ্ছে।

দুধকলা দিয়ে কালসাপ পোষার নজির তুলে অনবরত শাপশাপান্ত করছে কমলাকে!

ছি ছি, এতদিনের ঋণের এই শোধ?

বিয়ে করে ড্যাং ড্যাং করে বরের ঘরে গিয়ে উঠবি?

পড়শীরা সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'ওলো কেষ্ট, অত ফুঁসে মরছিস কেন? ভালই তো হলো, বুড়ো বয়সে আর উঞ্ছবৃত্তি করতে হবে না, বড়মানুষ জামাই মাসোহারা দেবে।'

কেষ্টমোহিনী সতেজে বলে, 'ঝাঁটা মারি অমন মাসোহারায়! কেষ্ট বোষ্টমী ভিক্ষের ভাত খায় না।'

কেষ্টমোহিনীদের অনেকেরই হয়তো এই জীবনদর্শন। হাত তুলে কেউ কিছু দিলে সে প্রাপ্তি তাদের কাছে জোলো বিস্বাদ, ঠকিয়ে

আদায় করে আনার মধ্যে অনেক রোমাঞ্চ। আর জীবনের শুরু থেকে উপার্জনের যে পথ দেখেছে, সেই তাদের কাছে সিধে সহজ স্বাভাবিক।

তাই বিয়েতে এদের বিরক্তি!

বিয়ে হওয়া মানেই তো ফুরিয়ে যাওয়া!

ফটোর জন্যে 'ডার্করুম' নয়। এমনি সন্ধ্যার পর আলো নিভিয়ে চুপচাপ নিজের খোপটুকুতে শুয়েছিল ননী।

দূর সম্পর্কে এক দিদির বাসায় খরচ দিয়ে থাকে সে। একক এই ঘরটুকু সেই দিদির বদান্যতা। আগে এ ঘরে শুধুই কাঠ ঘুঁটে আর সংসারের সব আবর্জনা থাকতো, ননী আসার পর থেকে আবর্জনা-গুলোকে কোণ-ঠাসা করে ননীও থাকে।

তবু এটুকুকেই স্বর্গ বলে মানে ননী।

তবুতো একেবারে নিজস্ব।

দরজাটায় খিল লাগিয়ে শুয়ে পড়লে তো সম্পূর্ণ একা হবার অপূর্ব সুখটুকু আছে। রাতে কারুর কাঠ ঘুঁটে দরকার হবে না।

দিদি বলেছিল গোড়ায়, 'তুই এখানে এই দালানের একপাশে শুবি।'

দালান মানে যেখানে দিদির সমগ্র সংসার। তা'ছাড়া ওই দালানের একপাশে দিদির বড় ছেলে তুটো শোয় তুখানা চৌকি পেতে। দিদি জামাইবাবু আর দিদির আরও গোটা পাঁচেক ছেলেমেয়ে রাত্রে না হ'ক দশবার ওঠে, আর ওই দালান দিয়েই আনাগোনা করে।

বাবাঃ!

মানুষের থেকে অনেক ভাল কাঠ ঘুঁটে।

এই ঘর, ফটোগ্রাফের দোকান, আর কমলাদের বাসা, এই তিন জায়গায় টানা পোড়েনের মধ্যে দিয়ে দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল একরকম করে,—যদিও কিসে আরও তু'পয়সা রোজগার করা যাবে, কী ক'রে কমলাকে উদ্ধার করা যাবে, এই চিন্তায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে থাকতো, তবুও তার মধ্যে বাঁধন ছিল। কিন্তু সহসা এ কী হলো, অলক্ষিতে কে কোথায় বসে ননীর প্রাণের সব বাঁধনগুলো এমন করে

কেটে দিলে।

সুতো কাটা ঘুঁড়ির মত লক্ষ্যহীন ননী আজকাল বেশির ভাগ সময় এই ঘরেই পড়ে থাকে। অসময়ে খায়, অসময়ে ঘুমোয়, অসময়ে কাজে যায়।

ময়লা জামাকাপড় পরতে ভালবাসত না, ক'দিন তাই-ই পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

যেন কিছুর জন্যে আর কিছু দায় নেই ননীর।

আচ্ছা, তবে আর ননীর এখানে পড়ে থাকার দরকার কী? কী দরকার স্টুডিওর মালিকের আর দূরসম্পর্কের দিদির খোশামোদে করবার? সব ছেড়েছুড়ে বেরিয়ে গেলেই তো আপদ চুকে যায়।

ধর, কাল ভোরেই যদি কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়ে ননী!

কী হবে?

কিছুই না।

কারুরই কিছু এসে যাবে না।

আর ননীর?

তারই-বা এসে যাবে কী?

জীবনে যদি আর কোনও উদ্দেশ্য না রইল, যন্ত্রণা কোথায়? একটা পেট—চালিয়ে নেওয়া এমন কিছু শক্ত নয়। আর যদিই বা না চলে, ননী মারা পড়লেই বা জগতে কার কী ক্ষতি?

ননীর মত লোকেদের জন্মানই ভুল। অতএব যত তাড়াতাড়ি সে ভুলের পরিসমাপ্তি হয়, ভালই। পৃথিবীর কিছু অন্ন বাঁচবে—

ঘরের দরজায় হঠাৎ টোকা পড়ল।

চমকে উঠে বসল ননী।

দরজায় টোকা দেয় কে?

টোকা দিয়ে মৃত্থ পদ্ধতিতে ডাকবার লোক তার কে আছে ?

খাবার টাইম হলে রান্নাঘর থেকে দিদির কাংস্যকণ্ঠ ধ্বনিত হয়,— 'এই ননী আসবি, না সমস্ত রাত হাঁড়ি আগলে বসে থাকবো ? ফি রোজ বাবুকে ডেকে ডেকে তবে খানা ঘরে আনতে হবে, কোনদিন নিজে থেকে ঠাঁইটা করে জলের গ্লাসটা নিয়ে বসতে নেই ? ক'টা দাসী বাঁদী আছে তোর ?'

কথাগুলো শুনতে যত কটু, তত গুরু নয়। দিদির কথাই ওই রকম। গুরুত্ব কেউ দেয় না ওর কথায়।

ভগ্নীপতি যেদিন তখনও আহার-নিরত থাকেন, মৃত্থ হাস্যে বলেন, 'তা' সেটা তো তোমারই দেখা দরকার। ওর নিজস্ব একটা বাঁদী জোগাড় করে দেওয়া তো তোমারই—'

এ ধরনের কথা বললে অবশ্য কথা আর শেষ করতে হয় না তাঁকে—। দিদি ফোঁস করে ওঠেন, 'কী! কী বললে ?…বাঁদী ? পরিবারকে তোমরা তাই ভাবো বটে !'

লেগে যায় ঝমাঝম !

ছেলেমেয়েগুলো হি হি করে হাসে।

কাজেই এ বাড়িতে এমন সূক্ষ্মবৃত্তির চাষ কোথাও নেই যে মৃত্থ টোকা দিয়ে দরজা খোলাতে চাইবে।

তা ছাড়া দরজা তো বন্ধ নেই, শুধু ভেজানো।

উঠে দরজা খোলবার আগেই ভেজানো দরজা খুলে যে মানুষটা ঢুকল, তাকে দেখে পাথর হয়ে গেল ননী।

দেখতে যে পেল, সে শুধু দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে কিঞ্চিৎ আলো ঢোকায়।

দেখতে পেল, তবু না করলো কোন প্রশ্ন, না করলো অভ্যর্থনা, —শুধু হাঁ করে তাকিয়ে থাকল।

'কী ননীদা, বাক্যি হ'রে গেল নাকি ?

'কমলা !'

'হ্যাঁ বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ? চিমটি কেটে দেখবে ?'

'চিমটির দরকার নেই, তবে বিশ্বাস করতে একটু দেরি হচ্ছে। তুমি এখানে ! এ সময়ে !'

'হ্যাঁ আমি, এ সময়ে। দরকার পড়লে কি আর সময় অসময়ের জ্ঞান থাকে ননীদা ?—সব বলছি, কিন্তু আগে আলো জ্বালো।'

'আলো ? কী হবে ? কে জানে কোথায় বাতি কোথায় দেশলাই।'

'কী আশ্চর্য। সে কী কথা ? ঘরে একটা আলোর ব্যবস্থা নেই ?'

'নাঃ। দরকারই বা কী ? তুমি তো আমার ডার্করুমই দেখতে চেয়েছিলে।

'কিন্তু আজ আর তা' চাইছি না ননীদা, আজ আলোর দরকার, ভয়ানক দরকার।'

ননী হাতড়ে হাতড়ে একটা দেশলাই খুঁজে জানলার নিচে পড়ে-থাকা একটা আধ-ক্ষওয়া বাতি জোগাড় করে জ্বেলে বলে, 'তুমি এলে কী করে তাই বল ?'

'এলাম।···চলে এলাম।'

'তুমি কি এ বাড়ি চিনতে ?'

'নাই বা চিনলাম, ইচ্ছে থাকলে আর চেষ্টা থাকলে ঠিকানা একটা খুঁজে বার করা এমন কিছুই নয়।'

'কিন্তু দিদি ?'

'দিদি !'

'হ্যাঁ আমার দিদি। তোমাকে ঢুকতে দেখে বললেন না কিছু ?'

'আমাকে,—না তো—আমি তো তাঁকে দেখিনি !'

'ভালই হয়েছে। কিন্তু আমি যে এ ঘরে আছি সেকথা—'

'একটা বাচ্ছা ছেলে বলল—ননীমামা ওই ঘরে পড়ে আছে।'

'পড়ে আছে' শুনে আশ্চর্যি হতে বলল—'রাতদিন তো পড়েই থাকে।'

'খুব ভুল বলেনি।'

'কেন—আগে তো খুব ব্যস্ত দেখতাম।'

'সে তো আগে। জীবনের সব ব্যস্ততা যখন নিয়েই নিল ভগবান, আর—'

'কী মুস্কিল, ভগবান আবার তোমার কী নিতে এল ! যাক একটু বসতে বলবে, না দাঁড়িয়েই থাকব ?'

ননী একটু ক্ষুব্ধ হাসি হাসে।'

'বসতে বলতে সাহস হচ্ছে কই ? তোমার উপযুক্ত আসন এখানে কোথায় ?'

'বাঃ চমৎকার কথা বলতে শিখেছ তো ! তুমিও গল্পের বই পড়া ধরেছ না কি ?'

'ধরতে হয় না, নিজেরাই তো এক একটা গল্প। যাক বসবে তো বোসো। এ ছাড়া তো আর জায়গা নেই।'

কমলা বসে পড়ে।

বসবার পরেই কিন্তু চুপ হয়ে যায়। চেষ্টা যত্ন করে অনেকখানি সপ্রতিভতা নিয়ে এসেছিল, প্রথম ধাক্কায় খরচ হয়ে গেছে সেটুকু। এখন বোবা।

ননী একটু অপেক্ষা করে বলে, 'দাঁড়াও তোমার জন্যে একটু চায়ের চেষ্টা দেখিগে।'

'তুমি'র দূরত্বটা অজ্ঞাতে কখন থেকে যে এসে পড়েছে !

'না না থাক ননীদা, কোন দরকার নেই।'

ননী একটু থেমে বলে, 'চা খাবার দরকার নেই সত্যি, কিন্তু দিদিকে একটু জানিয়ে আসা ভাল। নয় তো হঠাৎ দেখে কী না কী ভেবে বসবেন!'

এবার একটা কথার বিষয় পেয়ে বলে কমলা, 'কী বলবে?'

'বলবো? গোঁজামিল করে বুঝিয়ে দেব যা হয়। বলবো আমার মনি ববাড়ির একটি মেয়ে এসেছে ফটোর তাগাদা দিতে।'

'আমাকে তোমার মনি ববাড়ির মেয়ে বলে বিশ্বাস করবে?'

'বিশ্বাস!'

ননী সহসা আবেগরুদ্ধ স্বরে বলে, 'আমার মনিব তো সামান্য। তার চাইতে তো অনেক উঁচুডালের ফুল হয়ে যাচ্ছ। তাতেই কি বেমানান দেখাচ্ছে?···রাজার রানী বললেও তোমায় কেউ অবিশ্বাস করতে পারবে না কমলা!'

বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় ননী।

মোমবাতির আলোয় ওর মুখ দেখা গেল না, শুধু কণ্ঠস্বরটা বেচারার অবোধ হৃদয়ের বেদনাকে যেন ঘরের সমস্ত বাতাসে ছড়িয়ে দিল।

একটু পরেই একটা মোটা কাপে এক পেয়ালা চা নিয়ে ঢোকে ননী।

'তোমার ভাগ্য ভাল কমলা, চা একেবারে মজুত ছিল। দিদির তো অনেক প্রস্থ হয়।'

'দাও।'

হাত বাড়িয়ে কাপটা নিয়ে আস্তে আস্তে চাটা খেতে থাকে কমলা। যেন এই জন্যেই এসেছে।

ননী একটু পরে বলে—'কিন্তু আজ তুমি এ ভাবে এলে কেন তাই ভাবছি। বিয়ের নেমন্তন্ন করতে, না ধিক্কার দিতে?···তাই দাও। যত পারো দাও। শুধু কথা দিয়ে যদি না কুলোয় রাস্তার ধুলো এনে

গায়ে দাও। বোধহয় তাতেও হবে না। যে জানোয়ারের মত কাজ আমি করেছি সেদিন, তার শাস্তি হচ্ছে চাবুক!'

'জানোয়ারের মত!'

কমলা হেসে উঠে বলে, 'না ননীদা, তুমি ঠিক মানুষের মতই কাজ করেছ। এমন ক্ষেত্রে মানুষ মাত্রেই এ কাজ করে। শুধু মানুষ কেন, দেবতারাও ক্ষেপে ওঠে এ জায়গায়।'

'কিন্তু কমলা, আমি নিজেকে নিজে কখনো ক্ষমা করতে পারবো না। যখনি ভাববো হিংসেয় অন্ধ হয়ে কী ভীষণ ক্ষতিটাই তোমার করতে চলেছিলাম!···ভগবান তোমার সহায় হলো, তাই হলো না। নইলে—'

'আমি বলছি তোমার কিছু দোষ হয়নি ননীদা, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তারপর কী যে সেদিন হলো কিছুই জানতে পারলাম না। মোটা ভদ্রমহিলা কী বললেন তোমায়?'

'আমায়? —আমি কি সেখানে তিষ্ঠোতে পেরেছি কমলা, কাপুরুষের মতন পালিয়ে এসেছি।'

'পালিয়ে এসেছিলে?'

'হ্যাঁ কমলা পালিয়েই এসেছিলাম। তোমাকে অজ্ঞান হয়ে যেতে দেখে—'

'তুমি আমাকে পরের মতন 'তুমি তুমি' করছো কেন ননীদা? শুনতে ভাল লাগছে না।'

'ভাল লাগছে না?'

'কিন্তু যে মস্ত এক বড়ঘরের বৌ হতে যাচ্ছে, তাকে একটা রাস্তার ভ্যাগাবণ্ড 'তুই' বললেই বা ভাল শোনাবে কেন কমলা?'

'শুনবো তো আমি!'

'কমলা!'

'উঁহু, কমলি!'

'কমলি, কমলি, কেন আর একমুঠো ভিক্ষে দিয়ে মায়া দেখাতে

এসেছিস ? এর থেকে তুই আমায় লাঞ্ছনা করলেই আমার ছিল ভাল। বুঝতাম তবুও যে অনেক উঁচুতে উঠে যাসনি তুই…।'

'সেদিনের জন্যে আমি তোর কাছে ক্ষমা চাইতেও চাই না কমলি, তুই খুব লাঞ্ছনা কর আমায়।'

'কেন তা করবো ?' কমলা বলে, 'যা করেছিলে ঠিকই করেছিলে। বার-বার তো বলছি, তুমি ভেবেছিলে বড়লোকের হাত থেকে উদ্ধার করবে। আমরা হয়তো ধিক্কার দিতাম, যদি তুমি অসহায়ের মত কোন চেষ্টা না করে আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে।'

'কিন্তু তা' যদি দিসনি, কী বলতে তাহলে এসেছিস ?' ননী বলে।

'কী বলতে ?'…কমলা অদ্ভুত একটা হাসির সুরে বলে, 'বলছি। ননীদা,—আমায় নিয়ে পালাতে পারো ?'

'তোকে নিয়ে পালাতে !' যন্ত্রের মত উচ্চারণ করে ননী।

'হ্যাঁ ননীদা।—অনেক—অনেক দূরে। আমার বড্ড বিপদ !'

'কেন বল তো ?' ননী উদ্বিগ্ন স্বরে বলে, 'বিপদ কিসের ? তবে কি যা শুনেছি তা' ভুল ? ওরা কি তোকে পুলিসে দিতে চায় ?'

'পুলিসে ?—না, ননীদা। তার চাইতেও অনেক বেশি।'

কমলা ননীর দিকে চোখ তুলে তাকায়।

'তার চাইতেও বেশি !'—আবার যন্ত্রের মত উচ্চারণ করে ননী।

'হ্যাঁ তার চাইতেও বেশি, তার চাইতেও ভয়ের !'

'ব্যাপার কী ?'…হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে ননী,…'কী, করতে চায় কী ? …লোক লাগিয়ে খুন করতে চায় ?'

'লোক লাগিয়ে নয় ননীদা, নিজেই।'

কমলা কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে বলে, 'তোমার আশঙ্কাই সত্যি হয়েছে। তোমার শোনার ভুল হয়নি। তোমাদের লেক্‌চারবাবু সত্যি সত্যিই আমাকে বিয়ে করতে চায় ! তুমি আমাকে এ বিপদ

থেকে উদ্ধার কর ননীদা, আমাকে নিয়ে পালাও !'

ননী ধীরে ধীরে একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, 'তুই কি বাড়ি বয়ে আমাকে ঠাট্টা করতে এলি কমলা ?'

'ঠাট্টা নয় ননীদা, বিশ্বাস কর ! যে যার যুগ্যি নয়, তাকে তা' দিতে গেলে সেটা বিপদ ছাড়া আর কী ? তোমায় যদি কেউ রাজা করে সিংহাসনে বসিয়ে দিতে চায়, সেটাকে তোমার কী মনে হবে ? বিপদ না সম্পদ ?'

'পালিয়ে তোকে নিয়ে গিয়ে আমি রাখবো কোথায় ?'

ননী হঠাৎ নিজস্ব ভঙ্গিতে খিঁচিয়ে উঠে বলে, 'এখানে তো তবু এই খেলাঘরের মত একটু ঘর আছে, আর কোথাও পালিয়ে গেলে এটুকুই বা জুটবে কী করে ?'

কমলা আস্তে একখানা হাত ননীর হাতের ওপর রাখে। মৃদু রহস্য-ময় একটা হাসি ফুটে ওঠে তার মুখে,—'নতুন 'খেলাঘর' আমরা বাঁধবো, ননীদা !'

'কমলা !'

ননী ওর ধরা-হাতটা একবার চেপে ধরেই হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে তীব্র স্বরে বলে 'ওঃ দয়া ! দয়া করতে এসেছিস ?'

'না, ধরা দিতে এসেছি।'

কমলা মিষ্টি একটু হাসে, 'নিজের মনের কাছে ধরা পড়ে গেছি আজ।'

কাঠ ঘুঁটের ঘর থেকে ওরা বেরিয়ে এসেছে। এসে বসেছে পার্কের একটা বেঞ্চে।

অনেক কথা বলবার ছিল কমলার, সব কথা বলা যায় না সেই খুবরিতে বসে, কে 'কী ভাবছে'র—উৎকণ্ঠা নিয়ে !

ভাগ্যিস এই পার্কগুলো আছে পৃথিবীতে, আছে পার্কে বেঞ্চ

পাতার প্রথা, পুষ্পধনুর একটা আসন হয়েছে। পৃথিবীতে যদি পার্কের বেঞ্চ না থাকতো, এত প্রেমই কি জন্মাতো ?

তা' প্রেমের সেই পীঠস্থানেই এসে বসেছে ওরা—ননী আর কমলা। কমলা এতক্ষণ ধরে বলেছে তার এই ক'দিনের চিন্তা আর ঘটনা। বলেছে কেমন করে হঠাৎ তার সমস্ত ভয়ের বন্ধন খুলে গেল, কেমন করে কেষ্টমোহিনীর নাকের সামনে দিয়ে চলে এল একবস্ত্রে শুধু ননীর দেওয়া কয়েকটা বই হাতে করে। কেমন করে আশ্রয় পেল সহকর্মিণী প্রিয়লতার কাছে।

'বুঝলে ননীদা, হঠাৎ যেন চোখ থেকে কী একটা কুয়াশার পরদা সরে গেল।' কমলা বলে, 'মনে হল এত ভয় কেন করি আমি ? কেন করবো ?···ভয় দেখিয়ে একজন আমাকে দিয়ে যত ইচ্ছে মন্দ কাজ করিয়ে নেবে কেন ? পালিয়ে গেলে রুখছে কে ?···পালাতে চাইলে মাসি কি আমাকে আটকাতে পারতো ?···কখনো না। আমার সে খেয়ালই আসেনি। পরদা-ঢাকা চোখে ঘোরে পড়েছিলাম যে। হঠাৎ দেখলাম কিসের বন্ধনে বন্দী আমি ?···একমুঠো ভাত আর একটা আশ্রয়-এই তো! এতবড় পৃথিবীতে জুটবে না তা' ? সৎ থাকবো এই চেষ্টার বিনিময়ে পাবো না সেটুকু ? সত্যিই কি পৃথিবী এত নিষ্ঠুর ? তুমিও এই ভুলই করেছিলে ননীদা ! এত পরামর্শ দিতে পেরেছিলে আমায়, এত খেটেছিলে আমার জন্যে, তবু সাহস করে বলতে পারনি, চল কমলি আমরা পালাই। কিছু না পারি দু'জনে কুলি খেটেও দুটো পেটের ভাত জুটিয়ে নিতে পারবো।'

'আসল কথা, চট করে কুলিগিরির পথে নামতে আমরা পারি না, তাই আমাদের প্রতি পদে বন্ধন, প্রতি কাজে ভয়। ভদ্র পোশাকের মধ্যে নিজেকে ঢেকে যতদূর নয় ততদূর অভদ্রতা করবো, যত রকম দুর্নীতি আছে তাতে স্বীকার পাবো, স্বীকার পাবো না শুধু সেই ভদ্রলোকের পোশাকটা ছাড়বার। এতদিন ধরে এত 'ছোটমি' করতে

হতো না ননীদা যদি এ বুদ্ধি আমার আগে আসতো, যদি এ বুদ্ধি তোমার থাকতো। যাক তবু এই ভাল যে এখনও এল। প্রিয়লতার বাসায় আশ্রয় পেলাম। কত সমাদরে রাখল, বলল না 'তুই নীচ নোংরা'—বলল 'তুই প্রণম্য'। ও আবার একটু কবি কবি তো। দেখতে অবিশ্যি একেবারে বিপরীত।'

হেসে ওঠে কমলা।

•

ননী মাথা হেঁট করে বসে সব শুনল।

কমলার আক্ষেপ, কমলার উপদেশ। শুনল ইন্দ্রনাথ কিভাবে প্রিয়লতার মাধ্যমে কমলাকে ভাবী স্ত্রীর উপযুক্ত যৌতুক পাঠাচ্ছে। অর্থাৎ কিছুতেই যেন কমলা আর এতটুকু কষ্ট না পায়। বিয়ের ঘাঁটিও হবে ওই প্রিয়লতার বাড়ি। যদিও সে দুঃখী, কিন্তু বাড়িটা ভাল। বাড়িটা তার বাবার আমলের। দাদারা পৃথক হয়ে রয়েছে পার্টিশন দেওয়াল না তুলেই ; প্রিয়লতা মাকে নিয়ে একাংশে আছে। অল্প বয়সে বিধবা নিঃসন্তান প্রিয়লতার মা ছাড়া আর গতি কোথা?

কিন্তু বেশি বয়সে বিধবা, সন্তান সমাকুলা প্রিয়লতার মায়ের-ই বা মেয়ে ছাড়া গতি হলো কই ?

'এ যুগের এ ধর্ম' বলেছে প্রিয়লতা। ছেলেরা আর বিধবা মায়ের দায়িত্ব নিতে রাজী নয়, তাদের যুগলজীবনে মা বস্তুটা একেবারে অবান্তর। অতএব মেয়েরাই নিচ্ছে কাছে টেনে।'

'নিচ্ছে, বেশ করছে, উত্তম করছে, তারাও তো সন্তান। এখন রাখ তোর প্রিয়লতার কথা। আমি শুধু ভাবছি কমলি ইন্দ্রনাথবাবুর কথা। তিনি যখন টের পাবেন তুই পালিয়েছিস—'

'তখন ?'

কমলা শান্ত বরফ-জমানো গলায় বলে, 'তখন বুঝবেন তিনি দীঘি ভেবে ডোবার জল খেয়ে আসছিলেন !'

'তিনি তাই ভাববেন, এটা তুই সহ্য করতে পারবি ?'

'কী করবো ? একটা কিছু তো করতেই হবে ?'

'কিন্তু কমলি, ঝোঁকের মাথায় এতবড় একটা সৌভাগ্য ঠেলে ফেলে দিয়ে শেষকালে আপসোস করে মরতে হবে।'

'না—ননীদা আপসোস আমি করবো না। করবো না বলেই এই ক'দিন ধরে চব্বিশ ঘণ্টা শুধু ভেবেছি আর ভেবেছি। প্রিয়লতা বলতো—ভেবে ভেবে পাগল হয়ে যাবি তুই। তবু নিজেকে সব রকম অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখেছি, দেখে দেখে তবে না বুঝেছি ইন্দ্রের জন্যে দরকার শচীদেবীর। বিধাতাপুরুষ মানুষকে পাঠাবার আগেই রাজার জন্যে রানী আর ঘেসেড়ার জন্যে ঘেসেড়ানী ঠিক করে রাখেন। তোমার মতন বাউণ্ডুলের জন্যে এই বাউণ্ডুলীকে তৈরি করেছেন।'

'কমলি! তবু ভাল করে ভেবে দেখ।'

'দেখেছি—ননীদা দেখেছি।'

'আমি বলছি ইন্দ্রবাবু তোকে শুধু দয়াই করছে না, ভালবেসেও মরেছে।'

কমলা ঘাড় ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে বলে, 'এই কথাটাই খাঁটি বলেছ ননীদা, ভালবেসে মরেছে। কিন্তু ওঁকে মরতে দিলে তো চলবে না, অতবড় অপরাধের বোঝা বয়ে বেড়াতে পারবো না। ওঁকে বাঁচাবো এই পণ নিয়ে নিজেকে ঠিক করে নিয়েছি।'

'কিন্তু এত ক্ষমতা তুই পেলি কোথায় কমলি ?'

অভিভূত ভাবে বলে ননী।

কমলা বিষণ্ণ হাসি হেসে বলে, '—মুখ্যু মানুষ, মনের কথা ভাল করে বোঝাতে জানি না, তবু বলি ননীদা অনেকখানি পেলেই বুঝি অনেকখানি ছাড়া যায়। বাকী জীবনটা সুখে দুঃখে যেমন করেই কাটুক মনের মধ্যে এই আলোর আঁচড়টুকু জ্বলজ্বল করবে চিরকালের মতন,

সেই আমার মস্ত ঐশ্বর্য !’

‘আমার সারামাসের রোজগারের চাইতে বেশি টাকায় ইন্দ্রবাবু তোকে একটা পাউডার এনে দিত কমলি !’

নিশ্বাস ফেলে ননী।

কমলা মৃদু হাসির সঙ্গে বলে, ‘আর, সেই পাউডার মাখতে মাখতে আমার মনে পড়তো ননীদার সারা মাসের রোজগার এই কৌটোটার দামের চাইতে কম!’

‘তখন আমাকে তোর মনেই থাকতো না।’

‘মেয়েমানুষকে তোমরা তাই ভাবো ননীদা, কেমন ?’

‘নিষ্ঠুর অকৃতজ্ঞ হৃদয়হীন বলে—তাই না ? কিন্তু এই তোমায় বলছি ননীদা, মেয়েমানুষ যদি রানীর সিংহাসনেও বসে, সে ভুলতে পারে না তার ছেলেকে, ভুলতে পারে না তার প্রথম ভালবাসার লোককে।’

ইন্দ্রনাথ বাড়ি ফিরেছে। বাড়িতেই খায় দায়। কিন্তু সংঘের অফিসেই কাটছে তার বেশির ভাগ সময়।

সম্প্রসারণ চলছে একটা অবৈতনিক স্কুলের।

ওদিকে নীহারকণা স্যাকরা, বেনারসীওলা, হালুইকর, ডেকরেটার, বাড়তি ঝি চাকর ইত্যাদির সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছেন, আর ইন্দ্রনাথকে হাতের কাছে পেলেই একহাত নিচ্ছেন।

হয়তো বাড়ির ওই সমারোহটা ভারি অস্বস্তিকর লাগছে ইন্দ্রনাথের, তাই ঠিক এই সময় এই ছুতোটা করেছে। স্কুলের বৃদ্ধি আর ক'টা দিন পরে করলেও চলতো।

কিন্তু সংঘে বুঝি আর সে সম্ভ্রম নেই ইন্দ্রনাথের!

সকলেই বাঁকাচোখে তাকাচ্ছে, আর কৌতুকছলে বাঁকা ব'াকা কথা বলছে।

আশপাশ থেকে এমন কথাও কানে আসছে,—যারা ডুবে ডুবে জল খায় তারা ভাবে শিবের বাবাও টের পাচ্ছে না, কিন্তু টের সবাই পায়! এতদিন ধরে সবাই সব টের পেয়ে এসেছে।

অর্থাৎ চরিত্রগত দুর্বলতা ইন্দ্রনাথের বরাবরই ছিল, সকলেই তলে তলে জানতও। এবার নিশ্চয়ই নিতান্ত বেসামাল অবস্থায় পড়ে গেছেন চালাকঠাকুর, তাই এই বিয়ের ব্যবস্থা! তাই এত লোক জানাজানি।

বাদল ওদের দলে নয়।

বাদল ইন্দ্রনাথকে বড্ড বেশি ভালবাসে, তাই যখন তখন কড়া কথা বলছে। আজ এই মাত্র অনেক ঝগড়া করে গেল, অনেক যাচ্ছেতাই করে গেল।

বললে, 'সংঘের এবার বারোটা বাজল ইন্দ্রদা, সংঘের মেরুদণ্ডে ঘুণ

ধরেছে।'

ইন্দ্র হেসে বললে, 'এর উল্টোও তো হতে পারে? মেরুদণ্ডে অন্য শক্তির সঞ্চয় হয়ে আরো ভালও হতে পারে।'

'না পারে না।'

বাদল ক্রুদ্ধ হয়ে বললে, 'যা হতে পারে না, তার কল্পনায় সুখ থাকতে পারে, ফসল ওঠে না। তুমি এখন একটা ভাবের ঝোঁকে আছো ইন্দ্রদা, তাই বুঝতে পারছো না তোমার এটা দয়া নয়, মোহ। ...নির্জলা দয়া হলে মোটা খরচপত্র করে মেয়েটার একটা ভাল বিয়ে দিতে পারতে তুমি, তার জন্যে তাকে বিয়ে করবার দরকার হতো না। পৃথিবীতে দুঃখী অসহায় মেয়ের সংখ্যা একটা নয়, ক'জনকে বিয়ে করবে তুমি?'

ইন্দ্রনাথ ওর রাগ আর যুক্তি দেখে হেসে ফেলে বলেছিল, 'দয়া এ কথাই বা ভাবিস কেন? দয়া ছাড়া আরও তো কিছু হতে পারে!'

'না পারে না।'

তীব্র প্রতিবাদ করে উঠেছিল বাদল। 'ভালবাসা হয় সমানে সমানে। অসমান ভালবাসা শেষ পর্যন্ত টেঁকে না, তাকে টিঁকিয়ে রাখবার চেষ্টা করতে করতে জীবন বিকিয়ে যায়। এই মোহ ভাঙলে সে কথা টের পাবে।'

'অসমানকে কি সমান করে নেওয়া যায় না বাদল?'

'না যায় না। যাকে নিলে, বা নিয়েছ বলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করলে, শেষ পর্যন্ত সে-ই হয়ে ওঠে একটা বিরুদ্ধ শক্তি। এতটা পাওয়া বহন করতে যে শক্তি থাকা দরকার, সে শক্তি ক'জনের থাকে?'

'তুই এত কথা জানলি কোথা থেকে বাদল?'

'পৃথিবীতে চোখ কান খুলে চরে বেড়ালেই বোঝা যায় ইন্দ্রদা। তোমাদের কি জানো, রুপোর চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছ, চিরটা দিন

ভাবের ঘোরেই কাটিয়ে দিলে! জগৎকে দেখতে এসেছ পরোপকারীর উচ্চাসন থেকে, তাকে জানবার সুযোগই পাওনি। আমাদের তো তা' নয়।'

আরো কত কথা বলে গেল বাদল।

স্তব্ধ হয়ে বসে আছে ইন্দ্রনাথ।

মনের গভীরে তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করছে—বাদলের কথাই কি সত্যি?

শুধুই মোহ?…

কিন্তু কিসের মোহ?…রূপের?…রূপ কি আর আগে কখনো দেখেনি ইন্দ্রনাথ? এর থেকে অনেক রূপসী মেয়ের প্রলোভন দেখিয়ে নীহারকণা কি ভাইপোকে বিয়েয় প্ররোচিত করতে চাননি? তবে…?

ভালবাসা…?

তাই কি?

সেদিন যখন সেই ভয়ঙ্কর সত্যটা প্রকাশ হয়ে পড়ল, তখন কি সারা মন কেবলমাত্র ঘৃণায় বিষিয়ে ওঠেনি? ভালবাসার বাষ্পও কি ছিল আর তখন?

কমলা যদি শুধু লজ্জায় মাথা হেঁট করে থাকতো, অমন করে নিজের জীবনের নিরুপায়তার কথা না বলতো, ইন্দ্রনাথ কি তাকে চিরতরে ত্যাগ করে চলে আসতো না? ভিতরের ভালবাসা কি তাকে ক্ষমা করাতে শেখাতো?

তবে?

ভালবাসার সৃষ্টি তখন কি হয়েছিল?

হয়তো শুধু একটা আকর্ষণ!

রূপের নয়, বুদ্ধির। সরলতার, সরল বুদ্ধির, লাবণ্যের। সেই লাবণ্যবতীর অশ্রুসজল জীবনকাহিনী এনে দিল ভালবাসার জোয়ার।

সেটা কি দয়ারই নামান্তর নয়…?

দয়া করুণা—এর থেকে ভালবাসার উদ্ভব হয়, কিন্তু সেটা কি সারা জীবনের সম্বল হতে পারে?

এমন করে বুঝি নিজেকে বিশ্লেষণ করে দেখেনি ইন্দ্রনাথ এই ক'দিন। বাদল তাকে বড্ড ভাবিয়ে গেল।

বাদল বলে গেল, 'যার অতীতটা তোমার পরিবেশের সঙ্গে আকাশ পাতাল তফাত, সে কী করে তোমার কাছে সহজ হতে পারবে, বলতে পারো ইন্দ্রদা? তুমি বলছ 'স্ত্রীরত্ন দুষ্কুলাদপি'—শাস্ত্রের বচন, মানলাম। কিন্তু সে কোন্‌কালের কথা জানো? যে কালে স্ত্রীকে কেবলমাত্র 'স্ত্রীলোক' বলে ভাবা হতো, 'নট' জীবনসঙ্গিনী, এ সেই কালের কথা। একালে ও শাস্ত্র অচল। একালে রূপ থাক না থাক কুল-টা দরকার। দরকার বুদ্ধি আর রুচির সমতা!'

কিন্তু কমলার কি বুদ্ধি নেই…?

কমলার কি রুচি নেই…?

'দাদা!'

চমকে উঠে দরজার দিকে মুখ ফেরালো ইন্দ্রনাথ, দাদা বলে ডাকলো কে?

কে এই ছেলেটা?

কোথায় যেন ওকে দেখেছে না ইন্দ্রনাথ? চকিতের জন্যে একবার যেন…

'দাদা, সাহসে ভর করে আপনার কাছে এলাম।'

'কিন্তু আমি তো আপনাকে—'

'আপনি নয়, আপনি নয়, 'তুমি।' আমাকে আপনি চিনবেন না

দাদা, চেনবার যোগ্য মানুষও আমি নই, কিন্তু একজন এসেছে সঙ্গে তাকে আপনি চেনেন।'

'কে?'

চমকে ওঠে ইন্দ্রনাথ।

'এই যে! এস কমলা। দাদার সামনে এসে দাঁড়ানো, এইটাই হোক তোমার সমস্ত অপরাধের শাস্তি।'

'দাদা…আপনার অক্ষম ছোট বোনটাকে ক্ষমা করুন।'

অস্ফুটে কথাটা উচ্চারণ করে মাথাটা ইন্দ্রনাথের পায়ে লুটিয়ে দিয়ে সে আর সেই লুটোনো মাথাটা কিছুতেই তুলতে পারে না!

ইন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে তার সেই নত মাথার উপর আলতো একটু হাতের স্পর্শ রেখে বলে, 'থাক থাক, ওঠো।'

কমলা ওঠে, কিন্তু মুখ তোলে না।

কিছুক্ষণ নিঝুম নীরবতা।

ইন্দ্রনাথ শান্ত স্বরে বলে, 'তোমারই নাম বোধ হয় ননী, তাই না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' ননী মাথা চুলকে বলে 'নামটা জানেন দেখছি।'

'তা জানতাম। খুশী হলাম তোমাকে দেখে।…ওঠো কমলা।… বুঝতে পারছি এই ঠিক হলো।'

'দাদা!'

'থাক কমলা, বেশি চেষ্টায় দরকার নেই,…আস্তে আস্তে হয়ে যাবে।' সত্যিই খুসী হচ্ছি তোমাদের দেখে।'

বাচাল আর বকাটে ননী বলে ওঠে, 'দেখলে তো কমলা, বলছিলে না বরং মরা সহজ তো ওঁকে মুখ দেখানো সহজ নয়!…পেলে না ক্ষমা? আমি বললাম দাদা—দেবতার কাছে আবার দাঁড়াতে পারা না পারার কথা কী? সব আমিত্ব ছেড়ে গিয়ে পায়ে পড়লেই হলো।'

ইন্দ্রনাথ তাকিয়ে দেখল ওই নির্বোধ শ্যামলা মুখের উজ্জ্বল স্বর্ণাভা,

দেখল ওই গোলগাল মাথা খাটো ছেলেটার পাশাপাশি কমলার বেতগাছের মত ঋজু একহারা দীর্ঘ সতেজ দেহখানি।

দেখতে দেখতে অদ্ভুত একটা কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল ইন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণধীমণ্ডিত মুখে।

কী লজ্জা! কী লজ্জা!

কী হাস্যকর পাগলামিতেই পেয়েছিল ইন্দ্রনাথকে! ওর সঙ্গে প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা!

মৃদু হাসি হেসে বলে, 'কিন্তু অপরাধটা কার, শাস্তি দেবার মালিক বা কে—কিছুই তো বুঝতে পারছি না।'

'আপনি আর বুঝতে পারছেন না দাদা? ননী পরম সপ্রতিভ ভাবে বলে, 'তবে কিনা আপনি মহিমময়, তাই।'

'বাঃ তুমি তো বেশ ভাল বাংলা জানো দেখছি। কিন্তু—আমার ক্ষমার কি সত্যিই দরকার আছে তোমাদের?'

হয়তো প্রশ্নটা কমলাকেই, ননী উপলক্ষ্য।

তবু উত্তরটা ননী-ই দেয়।

'আছে বৈকি দাদা, আপনার আশীর্বাদ, আপনার ক্ষমা, এই সম্বল করেই তো আমাদের জীবনযাত্রার শুরু হবে!

'হুঁ!'

আর একবার কৌতুকের হাসি হেসে ওঠে ইন্দ্রনাথ।

'এত ভাল ভাল কথা জানো, আর উপার্জনের জন্যে মানুষ জাল করা ছাড়া আর কিছু ভাল মাথায় আসেনি কেন?'

'এই কান মলছি দাদা, আর কখনো ওদিকেও যাব না।'

'কিন্তু একটা ব্যাপারে ভারী খটকা লাগছে আমার কমলা!' কমলার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিপাত করে বলে ইন্দ্রনাথ, '—জাল অরুণাকে ধরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে তোমার এই ননীদার উৎসাহই প্রবল দেখেছিলাম

না ?···গাড়িতে তো সেদিন···'

কমলাও এবার পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। তারপর মৃদুস্বরে বলে, 'বুদ্ধিহীনেরা ওই রকম কাজই করে দাদা, মনের যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে—'

আরও একবার মনে হলো ইন্দ্রনাথের—কী লজ্জা, কী লজ্জা ! এর সঙ্গে প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা !

আর কমলা···!

জীবনসঙ্গী হিসেবে ওকেই উপযুক্ত বলে বেছে নিল তা'হলে !

বাদলের কথাই তবে ঠিক।

পরিবেশের প্রভাব কাটিয়ে ওঠা সহজ নয়।

যাক, ঈশ্বর রক্ষা করেছেন ইন্দ্রনাথকে।

কোথা থেকে যেন কী এক মুক্তির হাওয়া এসে গায়ে লাগে। বারবার মনে বাজতে থাকে—এই ভাল হলো এই ভাল হলো।

কিন্তু কমলার ওই চোখদুটো ?

ও কি শুধু সেই পরিবেশের প্রভাবের কথাই জানাচ্ছে ?

তবে ও চোখের দৃষ্টি অত গভীর, অত অতলস্পর্শী কেন ?

ধীরে ধীরে স্নিগ্ধ একটা প্রসন্নতা ফুটে ওঠে ইন্দ্রনাথের মুখে।

কমলা বুদ্ধিমতী !

কমলা হৃদয়বতী !

ইন্দ্রনাথের জীবনে কলঙ্করেখা হয়ে দাঁড়াতে চায় না ও।

পারে না ওই সরল অবোধ ছেলেটার জীবন অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিতে।

বড় ভাইয়ের মতই প্রসন্ন আশীর্বাদের স্বর উচ্চারিত হলো। 'যদি মানুষের আশীর্বাদের কোন মূল্য থাকে তো আশীর্বাদ করছি সুখী হও তোমরা, সুখী হও।'

ইন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর গভীর গম্ভীর।

কমলার চোখে টলটলে জল।

ননী একবার ঘরের এই ভারী ভারী আবহাওয়ার দিকে তাকিয়ে দেখল, তারপর···হঠাৎ মাথাটা চুলকে নিতান্ত লঘুস্বরে বলে উঠল 'তা'হলে দাদা শুধু আশীর্বাদ দিলেই হবে না, ভাল মত একটা চাকরি দিতে হবে। সংসার আছে চাকরি নেই,—হাঃ হাঃ হাঃ। এ একেবারে 'দোয়াত আছে কালি নেই'-এর মত!'